বিজ্ঞান (www.bigyan.org.in) – এর কিছু বাছাই লেখার সংকলন

বিজ্ঞান পত্রিকা

চতুর্থ সংখ্যা | জুলাই ২০১৬

পদার্থবিদ্যার কিছু বিস্ময়

নিউটনের সূত্র ও রেফারেন্স ফ্রেম

জীবন বিজ্ঞান

অটিজম-এর কি একটাই দাওয়াই?

প্রযুক্তি বিজ্ঞান

সৌরশক্তির যাদু : কম ভোল্টেজে

আরো থাকছে - অন্যান্য প্রবন্ধ!

বিজ্ঞান পত্রিকা

যারা বিজ্ঞান ভালবাসে, বা ভয় পায় তাদের জন্য ...

বিজ্ঞান পত্রিকা

চতুর্থ সংখ্যা
জুলাই ২০১৬

www.bigyan.org.in-এর বাছাই করা লেখার সংকলন

‘বিজ্ঞান’ সম্বন্ধে জানতেঃ

ওয়েবসাইট - www.bigyan.org.in
ফেসবুকের পাতা - https://www.facebook.com/bigyan.org.in

ইমেইল - bigyan.org.in@gmail.com

সূচীপত্র

বাদুড়ের বাদড়ামি
অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ০৬

রাতের ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে আমরা যখন কানা, বাদুড় অনায়াসে শিকার ধরতে পারে দূর থেকে। নিজের ডাকের প্রতিধ্বনি শুনে। কিন্তু একসাথে অনেক বাদুড় এসে জুটলে, কে কার ডাক শুনছে তা বোঝে কি করে ? এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দুই বিজ্ঞানী বাদুড়সমাজের এক সম্পূর্ণ অপিরিচিত চেহারার সম্মুখীন হলেন। সেই গল্প বলছে অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়।

নিউটনের সূত্র ও রেফারেন্স ফ্রেম
জয়ন্ত ভট্টাচার্য ০৯

নিউটনের সূত্র নিয়ে স্কুলের বিজ্ঞান বইগুলোতে প্রচুর ভুলে ভরা কথাবার্তা লেখা থাকে। সেই সব ভুলভ্রান্তি কাটানোর উদ্দেশ্যে নিউটনের সূত্র নিয়ে লিখেছেন এলাহাবাদের হরিশচন্দ্র গবেষণা কেন্দ্রের পদার্থবিজ্ঞানী এবং অধিকর্তা (ডিরেক্টর) প্রফেসর জয়ন্ত ভট্টাচার্য

পাঠকের দরবার – নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে কি তৃতীয় সূত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়?
জয়ন্ত ভট্টাচার্য ২২

নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে প্রথম গতিসূত্র প্রমাণ কর, বা দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে তৃতীয় গতিসূত্র প্রমাণ কর - এমন প্রশ্ন বিভিন্ন স্কুলের পরীক্ষায় এমনকি সরকারি বোর্ডের পরীক্ষায় এসে থাকে। প্রশ্নগুলো খুবই দুর্ভাগ্যজনক। পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর জয়ন্ত ভট্টাচার্য বোঝাচ্ছেন কেন এই প্রশ্নগুলো সঠিক নয়।

সৌরশক্তির যাদু : কম ভোল্টেজে
শেখর ব্যানার্জী ও পার্থসারথি মজুমদার ২৪

এত রোদ যে-দেশে, সেখানেও কেন দুঃস্থ কোন স্কুল পড়ুয়াকে মোম বা কেরোসিনের আলোয় পড়তে হবে, তা বোঝা কঠিন। এবং, এই অভাবের প্রতিকারের উৎকৃষ্ট উপায় হাতে থাকতেও কেন তা উপেক্ষা করে চলেছি বছরের পর বছর, সেটা বোঝা সত্যি দুষ্কর। শেখর ব্যানার্জী এবং পার্থসারথি মজুমদার সুপার ক্যাপাসিটার ব্যবহার করে সৌরশক্তিকে কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে, তার উপর হাতে কলমে করা কিছু পরীক্ষার কথা জানাচ্ছেন।

অটিজম-এর কি একটাই দাওয়াই?
অলকানন্দা রুদ্র ৩০

আমাদের সমাজে শারীরিক অসুখ নিয়েই বেশি চিন্তিত হই আমরা। কিন্তু মানসিক অসুখ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা আর সচেতনতা সমানভাবে প্রয়োজন। মানসিক অসুখগুলির তালিকায় অটিজম (autism)-এর নাম প্রথম দিকেই থাকবে। অটিজমের উপসর্গ অনেকসময় রোগীর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ক্ষমতারও জন্ম দেয়। কিন্তু সেই সীমিত অস্বাভাবিক ক্ষমতা স্বত্ত্বেও এই ধরণের রোগীকে অনেকরকমের সামাজিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আধুনিক সভ্যতার এক অন্যতম ধাঁধা এই জটিল রোগটির কারণ কি? এর থেকে মুক্তির কোনো উপায় কি মানুষ বের করতে পেরেছে? সেইসব নিয়েই আজ বিজ্ঞানের পাঠকদের অবহিত করছে এই বিষয়ের গবেষক অলকানন্দা রুদ্র।

সম্পাদকীয়

'বিজ্ঞান' ওয়েবসাইটের লেখাগুলি থেকে পাঁচটি লেখা নিয়ে আমরা প্রকাশ করতে চলেছি বিজ্ঞান পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দম-বন্ধকর চাপের মাঝে বিজ্ঞানপাঠের উৎসাহ ফিরিয়ে আনতে 'বিজ্ঞান'-এর প্রচেষ্টা শুরু করেছিলাম আমরা। পাঠকদের কাছ থেকে যে বিপুল সাড়া পেয়েছি, তাতে আমাদের উৎসাহ আর এক নতুন মাত্রা পেয়েছে।

আগের সম্পাদকীয়গুলোতে আমরা বলেছিলাম মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার কেন প্রয়োজন, কিংবা কেন আমরা এই 'বিজ্ঞান পত্রিকা' শুরু করলাম। এবার প্রচলিত বিজ্ঞানশিক্ষা কেন এই প্রয়োজন সঠিকভাবে মেটাতে পারছে না, তার একটি দিকের উল্লেখ করতে চাই। আমরা জ্ঞান-উন্মেষের পর থেকেই "বিজ্ঞানের গরিমা" শুনতে শুনতে বড় হই। খুব ছোট বয়সেই অঙ্ক বা বিজ্ঞানকে বাৎসরিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের চাবিকাঠি এবং সমাজের চোখে বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচয় হিসাবে মজ্জাগত করে ফেলি।

কিন্তু, এই ধরণের ভাবনা বোধহয় বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপন্থী। একটা উদাহরণ দিই। বিজ্ঞানের ক্লাসে আমরা হরেক "সূত্র"-এর সাথে পরিচিত হই এবং সেগুলো থেকে নানা রকমের প্রবলেম সমাধান করি, মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন করি। অনেকে বিজ্ঞানচর্চা আর বিজ্ঞানের সূত্রের ফর্মুলা জানা প্রায় সমার্থক শব্দ হিসাবেই ব্যবহার করে। এসবের মাঝে আমরা খুব একটা ভেবে দেখিনা, "সূত্র বা তাদের সাথে যুক্ত ফর্মুলাগুলোর গুরুত্ব কি?" কোন ক্ষেত্রে কোন ফর্মুলা লাগছে, বহু প্র্যাক্টিসের মাধ্যমে তার একটা আন্দাজ তৈরি করতে পারলেই যেন খেল খতম!

অথচ সূত্রগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি না করতে পারলে কিছুই বোঝা হলো না তো! মহাবিশ্বে কতশত হরেক রকমের বস্তু আছে। এদের আকৃতি ভিন্ন, রং ভিন্ন। সমস্ত বস্তুর মধ্যে যে সার্বজনীন বৈশিষ্ট থাকবে, এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয় নি। কিন্তু তবুও জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে নানারকম সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়! এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কি? নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের কথাই ধরা যাক। ছোট-মাঝারি-বড়ো, কঠিন-তরল-গ্যাস সবাই একই নিয়ম মেনে আকর্ষণ করছে, এটা একটা দারুণ ব্যাপার নয় কি?

বিজ্ঞান পড়ার সময় এই বিষয়গুলি যদি ভেবে না দেখি অথবা যদি জিগ্যেস করার সুযোগ না থাকে তাহলে বিজ্ঞানচর্চা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সূত্রগুলিকে প্রশ্ন না করেই মুখস্থ করার মধ্যে কোনো মেধার পরিচয় নেই। সর্বোপরি, যেহেতু অনেক সূত্রের কোনো প্রমাণ হয়না, তাই এদের সম্ভাব্য সংশোধন বা সংযোজন নিয়ে চিন্তা ভাবনা আবশ্যক। কিন্তু চোখ বুজে সব মেনে নিলে সেসবের সুযোগ কই?

একই কথা বলা যায় তথ্যের ক্ষেত্রেও। পরীক্ষায় কত তথ্যমূলক প্রশ্ন আসে - পৃথিবীর থেকে সূর্যের দূরত্ব কত, ইলেক্ট্রনের ভর কত, অ্যাভোগাড্রো সংখ্যার মান কত, বৃহস্পতির ব্যাস কত, প্রোটনের আধান কত ইত্যাদি। এগুলো মুখস্থ করে নম্বর পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আজ যেখানে ইন্টারনেট, 'গুগল'-এর সৌজন্যে নিমেষে এই তথ্য হাতের মুঠোয় তখন এই জিনিসগুলো মুখস্থ করার মানে কী? বরং আমরা প্রশ্ন করি এই তথ্যগুলো কোথা থেকে এল তা নিয়ে। কী করে মাপা হল ইলেকট্রনের ভর? এই অতিক্ষুদ্র কণার ভর যে পদ্ধতিতে মাপা হয়, সেই একই পদ্ধতিতে কি আমরা সূর্যের ভরও মাপতে পারি। কী করেই বা মাপব বিশাল কোন গ্যালাক্সির ভর? বা আলোর ভর? প্রশ্ন করতে শেখার মজা হল একবার তা শুরু হলে থামতেই চায় না!

নিউটন সাহেব প্রশ্ন করেছিলেন – আপেলটি কেন নিচে পড়লো? বর্তমানে কিছু শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে মনে হয় তিনি হয়তো কোনো দিন প্রশ্নটি করার সাহস করতেন না।

না জানা বা না বোঝা কোনোটিই বিজ্ঞানচর্চার অন্তরায় নয়। বরং নিজের অজ্ঞতাকে উপলব্ধি করা বিজ্ঞান চর্চার প্রথম ধাপ। 'বিজ্ঞান পত্রিকা'-তেও আমরা সেটাই মাথায় রেখে চলি। শুধু কিছু তথ্য পরিবেশন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা চাই পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগাতে।

এই পত্রিকায় নিউটনের গতিসূত্র ও দর্শক (observer)-এর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী জয়ন্ত ভট্টাচার্য। বহু বছরের শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতায় তাঁর উপলব্ধি - "পদার্থ বিজ্ঞানের স্থানীয় পাঠ্যপুস্তক গুলিতে নিউটনের সূত্র (Newton's laws) সম্বন্ধে যা প্রাণ চায় তাই লেখা থাকে। সভ্য জগতে কোথাও এটা দেখা যায় না।" ভাবনা-চিন্তা না করে বিজ্ঞানের সূত্র পড়ার যে পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমরা অনেকেই বেড়ে উঠেছি, এখনো পরীক্ষায় আসা কিছু প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় "সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে"। 'বিজ্ঞান'-এর দুই পাঠক এমন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। প্রশ্নটি হল - নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে তৃতীয় গতিসূত্র কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। 'পাঠকের দরবার' বিভাগে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন প্রফেসর ভট্টাচার্য-ই। ভালো ফলাফলের তাগিদে আমরা অনেকেই নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে প্রথম সূত্র বা তৃতীয় সূত্র 'প্রমাণ' করেছি। ভেবে দেখিনি - যদি দ্বিতীয় সূত্র থেকে প্রথম সূত্র পাওয়াই যায়, তাহলে নিউটন আলাদা করে প্রথম সূত্রটা লিখতে গেছিলেন কেন ?

পত্রিকার কলেবরের দিকে তাকিয়ে এই সংখ্যায় লেখার পরিমাণ সীমিত রাখা হল। নিউটনের সূত্রের উপর লেখাদুটো ছাড়াও পত্রিকার অন্য লেখাগুলিও শুরু হয়েছে প্রশ্ন থেকেই। যেমন:

- "সৌরশক্তির জাদু: কম ভোল্টেজে" - সূর্যের তেজকে দৈনন্দিন জীবনে সরাসরি কিভাবে কাজে লাগানো যায়?
- "বাদুড়ের বাদড়ামি" - আমরা জানি বাদুড় নিজের ডাক ছেড়ে তার প্রতিধ্বনি শুনে দিক নির্ণয় করে, কিন্তু অনেকগুলো বাদুড় জুটে গেলে কে কার ডাকের প্রতিধ্বনি শুনছে সেটা বোঝে কি করে?
- "অটিজম-এর কি একটাই দাওয়াই?" - অটিজম একটা রোগ না শুধু অনেকগুলো আলাদা আলাদা চারিত্রিক বৈশিষ্টের সমষ্টি? কখন সেটা রোগের আওতায় আসে? রোগটা ধরেই বা কি করে আর রোগীদের চিকিৎসাই বা কি?

আশা করি সব কটি লেখা পাঠকদের খুব ভালো লাগবে। অনুরোধ রইলো চারপাশে সবার মধ্যে বিজ্ঞান পত্রিকাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

সম্পাদকমন্ডলী, 'বিজ্ঞান'
৩-রা জুলাই, ২০১৬

‘বিজ্ঞান’-এর সম্পাদনায় যারা আছি

- কুণাল চক্রবর্ত্তী (ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ব্যাঙ্গালোর)
- কাজী রাজীবুল ইসলাম ((ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, কেমব্রিজ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- দিব্যজোতি ঘোষ (অ্যাডোবি, সান হোসে, ক্যালিফোর্ণিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় (ম্যাথওয়ার্কস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অর্ণব রুদ্র (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র; NGO পদক্ষেপ-এর সদস্য)
- অর্ণব রুদ্র (ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডেভিস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র; NGO পদক্ষেপ-এর সদস্য)
- শাওন চক্রবর্তী (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সুমন্ত্র সরকার (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- কাজী ফারহা ইয়াসমিন (আই বি এম, কলকাতা)
- আবির দাস (ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, লোয়েল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- চিরঞ্জীব মুখার্জী (হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ)
- দীপ্যমান প্রামাণিক (হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ)
- বিতান ঘোষাল (ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার, মুম্বই)
- ঝুমা সন্নিগ্রাহী (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট, ড্রেসডেন, জার্মানী)
- অমলেশ রায় (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর কোল রিসার্চ, জার্মানী)
- সূর্যকান্ত শাসমল (কগনিজেন্ট, কলকাতা)

‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র সম্পাদনা - সূর্যকান্ত, অর্ণব, অনির্বাণ ও রাজীবুল।

প্রচ্ছদ ও পত্রিকার নকশা - সূর্যকান্ত

বাদুড়ের বাদড়ামি

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়
ম্যাথওয়ার্কস (ম্যাসাচুসেটস)

পশুজগতের অনেক প্রাণীর শ্রবণশক্তি আমাদের তুলনায় প্রখর, কিন্তু বাদুড়ের ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। সে নিজের ডাকের প্রতিধ্বনি শুনে ঠাওর করতে পারে, মক্কেল কত দূরে, কি তার গতি। আলোর দৌলতে আমরা যতটা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করি, বাদুড় ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে এই প্রতিধ্বনির সাহায্যে হয়ত একটু বেশীই করতে পারে। ছোঁ মেরে পোকা ধরতে পারে নিমেষের মধ্যে, এতটাই নিখুঁত তাদের দিশা-নির্ধারণ ক্ষমতা। শ্রবণ, দৃষ্টি - এই কথাগুলো গুলিয়ে যায় বাদুড়দের কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলে।

এদ্দুর শুনে খোকন নিশ্চই এবার প্রশ্ন করবে - সে তো হলো, কিন্তু একজাতের অনেকগুলো বাদুড় এসে জুটলে তখন? রামবাদুড় ডাক ছাড়ল আর শ্যামবাদুড় তার প্রতিধ্বনি শুনে বুঝে গেল লক্ষ্য কোথায়, এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। শ্যামকে অন্তত নিজের ডাক ফেরত পেতে হবে। কিন্তু শ্যাম বোঝে কি করে কোনটা নিজের ডাক আর কোনটা রামের? এক জাত হলেও সবার ডাক কি তাহলে আলাদা আলাদা ?

দেখা যায়, ঠিক তা নয়। একটা বাদুড় নিজের ডাকের মাপজোখ - বিভিন্ন কম্পাঙ্কে (frequency) কতটা প্রসার (amplitude) - সেটা পালটাতে পারে যাতে জাতভাইয়ের সাথে তার ডাক ঘেঁটে না যায়। এই নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। একে বিজ্ঞানীদের ভাষায় বলে, "jamming avoidance

response"। সেলফোনের সিগনাল যেমন জ্যাম করে দিলে সেটা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যায়, বাদুড়ের-ও সেই দশা। তাই বিবর্তনের সাথে সাথে তাদের জ্যামিং এড়ানোর ক্ষমতাও গজিয়েছে।

এবার প্রশ্ন হলো, স্বেচ্ছায় বাদুড় যখন নিজের ডাক পালটাতে পারে জ্যামিং এড়াতে, তখন উলটোটা হতেই বা বাধা কোথায়? ইচ্ছে করে অন্য বাদুড়ের ডাক ঘেঁটে দিয়ে তাকে শিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজে থাবা বসাতেই বা দোষ কি?

দুই বিজ্ঞানী - Aaron Corcoran ও William Conner - এই প্রশ্নটা তুললেন। একটা বিশেষ প্রজাতির বাদুড় - Mexican free-tailed বাদুড় (T. Brasiliensis) - নিয়ে তাঁরা গবেষণা করছিলেন। এই প্রজাতির বিশেষত্ব হলো: প্রতিধ্বনি-ভিত্তিক দিশা-নির্ধারণ ক্ষমতা আছে এমন প্রজাতির মধ্যে এদের কলোনীতেই বাদুড় সংখ্যা সবথেকে বেশি। তাই বাদুড়দের সামাজিক আচরণগুলি লক্ষ্য করার সুযোগ-ও বেশি।

অন্তত খান পনেরটা আলাদা ধরণের ডাক এই প্রজাতির মধ্যে তাঁরা সনাক্ত করতে পারলেন। তার মধ্যে বিশেষ একটা ডাক নিয়ে আগে পড়াশোনা হয়নি। এর বর্ণচ্ছটার চরিত্র দেখে এর নাম দেওয়া হলো sinFM ডাক। প্রাথমিক কিছু পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেল - এই ডাকটা তখনই বার হয় যখন অন্য কোনো বাদুড় খুব দ্রুত একের পর এক ডাক ছাড়ছে। অর্থাৎ শিকারের পেছনে ধাওয়া করছে। এই দ্রুত ডাক ছাড়া কে বলে feeding buzz। বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্ন জাগলো - এই sinFM ডাক-এর উদ্দেশ্য কি? প্রতিযোগী বাদুড়কে চমকে দেওয়া? ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা? নাকি এই sinFM ডাক প্রতিযোগী বাদুড়ের feeding buzz কে ঘেঁটে দিতে পারে?

অনেকগুলো জিনিস লক্ষ্য করা গেল, যাতে মনে হয় শেষেরটাই। sinFM ডাক আর প্রতিযোগী বাদুড়ের feeding buzz একে অপরের সাথে তাল মিলিয়ে চলে। যেমন, sinFM ডাকের একটা পুরো চক্কর (cycle) প্রতিযোগী বাদুড়ের ডাক ছাড়া আর প্রতিধ্বনি শোনা, এই সময়টুকুর মধ্যে গুঁজে দেওয়া যায়। তারপর sinFM ডাকের বর্ণচ্ছটার চরিত্র প্রতিযোগী বাদুড়ের ডাক জ্যাম করে দেওয়ার জন্য আদর্শ।

এরপর বিজ্ঞানীরা একটা মজার পরীক্ষা করলেন। sinFM ডাক রেকর্ড করে বাদুড়ের শিকারকালে চালিয়ে দেখলেন কি হয়। দেখা গেল, বাদুড়ের feeding buzz-এ কোনো ফারাক হয়না sinFM ডাক চালালে। অথচ শিকার ধরার সাফল্য কমে যায় প্রায় ৭০ শতাংশ। অর্থাত ওই ডাকে বাদুড় ভয় পায় না, ঘাবড়েও যায় না। ক্রমাগত ডাক ছেড়ে যায়, অথচ প্রতিধ্বনি ঘেঁটে যাওয়ায় শিকার ঠাওর করতে পারে না।

এবার প্রশ্ন হলো, স্বেচ্ছায় বাদুড় যখন নিজের ডাক পালটাতে পারে জ্যামিং এড়াতে, তখন উলটোটা হতেই বা বাধা কোথায়? ইচ্ছে করে অন্য বাদুড়ের ডাক ঘেঁটে দিয়ে তাকে শিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজে থাবা বসাতেই বা দোষ কি?

আর একটা পরীক্ষা করলেন বিজ্ঞানীরা। sinFM-এর বদলে একই কম্পাঙ্কের শব্দ এবং সব কম্পাঙ্কের খিচুড়ি একটা কোলাহলমার্কা শব্দ-, এই দুটো চালালেন বাদুড়ের শিকার ভাঙ্গতে। শিকারের সাফল্যে কোনো হেরফের হলো না। অর্থাত sinFM ডাক শুধু চমকে ধ্যানভঙ্গ করে তাই নয়। তাহলে ধ্যানভঙ্গ এতেও হত। শিকার ধরার সাফল্য কমত।

> Mexican free-tailed প্রজাতির বাদুড় জেনেবুঝে তার জাতভাইয়ের ভাত মারার তোড়জোড় করে

সব মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন তারা যে Mexican free-tailed প্রজাতির বাদুড় জেনেবুঝে তার জাতভাইয়ের ভাত মারার তোড়জোড় করে। তার সিগনাল জ্যাম করে পারতপক্ষে কিছুক্ষণের জন্য অন্ধই করে দেয় তাকে। আরো গবেষণার প্রয়োজন। তবে এই সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়, তাহলে পশুসমাজে এইভাবে প্রতিযোগীর ইন্দ্রিয়ের সাথে ছিনিমিনি খেলার উদাহরণ বোধহয় এই প্রথম।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2014/11/18/bats-jamming-bats/

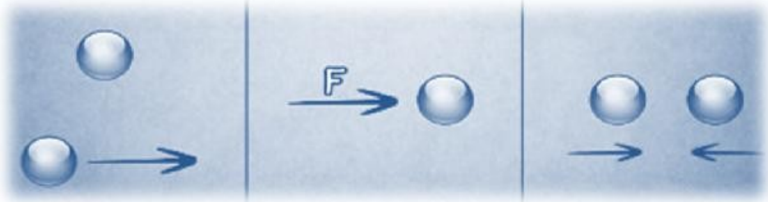

নিউটনের সূত্র ও রেফারেন্স ফ্রেম

জয়ন্ত ভট্টাচার্য
হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ

পদার্থ বিজ্ঞানের স্থানীয় পাঠ্যপুস্তক গুলিতে নিউটনের সূত্র (Newton's laws) সম্বন্ধে যা প্রাণ চায় তাই লেখা থাকে। সভ্য জগতে কোথাও এটা দেখা যায় না। এর ফলে শিখতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের অহেতুক হয়রানি। সহজে চোখে পড়া কয়েকটা ভুলভ্রান্তিও ঠিক করে শিখলে যে স্কুল-এর গন্ডী পেরোতে পেরোতেই অনেকটা এগোনো যায় সেটাই এই লেখার আলোচ্য বিষয়।

সমস্ত গতিবিদ্যার (Dynamics) শুরু নিউটনের তিনটি গতি সূত্র (laws of motion) দিয়ে। তিনটি সূত্র এইরূপ :

১) কোনো বস্তুর ওপর বাইরে থেকে প্রযুক্ত বল (externally applied force) না থাকলে সেই বস্তুটি হয় স্থির থাকবে, নইলে সে যে গতিতে যে দিকে চলছিল ঠিক সেই গতিতে সেই দিকে চলতে থাকবে।

২) যদি কোনো বস্তুর ওপর বাহ্যিক বল (external force) F প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেই বল (force) এর দিকে তার ত্বরণ (accelaration) হবে 'a', এই ত্বরণের মাপ পাওয়া যাবে F = ma এই সম্পর্কটি থেকে। এখানে 'm' হলো বস্তুর ভর (mass) । [এই ভরকে কে সাধারণত inertial mass বলে- inertia (জাড্য) হচ্ছে কোনো পরিবর্তনের বিরোধিতা করা, বাইরে থেকে প্রযুক্ত বলকে কে একটি বস্তু কতটা উপেক্ষা করতে পারবে এই inertial mass তারই মাপকাঠি।] যখন F = ma লেখা হলো, তখন ধরে নেওয়া হলো F-এর প্রয়োগকালে বস্তুর ভরের পরিবর্তন হচ্ছে না, যদি হয় তাহলে নিউটনের সূত্র বলে বল (force) হচ্ছে বস্তুটির ভরবেগ (momentum)-এর পরিবর্তনের হার:

$$F = \frac{d(mv)}{dt}$$

৩) দুটি বস্তু যদি একে অপরের উপর force প্রয়োগ করে তাহলে force দুটির মান সমান এবং তাদের দিক গুলি বিপরীত (equal and opposite)।

এইবার গন্ডগোল শুরু হলো, ভর অপরিবর্তিত ধরে নিয়ে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র লেখা হলো,

$$F = ma = m\frac{dv}{dt} \qquad (1)$$

ত্বরণ (acceleration) ‘a’ হচ্ছে বেগের পরিবর্তনের হার dv/dt [উল্লেখযোগ্য যে F, a সব-ই ভেক্টর, এদের মান (magnitude) এবং দিক (direction) দুই আছে কিন্তু আমরা নেহাত প্রয়োজন না হলে ভেক্টর ব্যবহার করব না - ধরে নেওয়া হবে ‘F’ যেদিকে ‘a ’ ও সেইদিকে]। Eq. (1) -এ F = 0 মানে dv/dt=0, অতএব v অপরিবর্তিত - তাহলে আমরা নিউটনের প্রথম সূত্রতে পৌঁছে গেলাম। নিউটন জোর করে অথবা ভুল করে তাঁর প্রথম সূত্র লিখেছিলেন - এটি পদার্থবিদ্যা শেখানোতে ভারতীয় শিক্ষক সমাজের অধিকাংশের চরম লজ্জাজনক অবদান। কেন এই ভুল হলো ?

এইবার সেটা বোঝার জন্য প্রথমেই দরকার রেফারেন্স ফ্রেম (reference frame) - আমি যদি কোনো বস্তুর অবস্থান বা গতি বা ত্বরণ মাপতে চাই তাহলে প্রথমেই প্রয়োজন একটি coordinate system এবং একটি ঘড়ি (ধরে নেওয়া হবে ঘড়িটা সকলের সমান)। কিন্তু প্রত্যেকের coordinate system তার নিজস্ব। আমি যদি মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে একটি চলমান বাসের গতি মাপতে পারি ঘন্টায় কুড়ি কিলোমিটার, কিন্তু আমি যদি ঐ একই বেগে চলা একটি গাড়ি থেকে দেখি তাহলে দেখব বাসের গতি শূন্য। যে একটি বস্তুর গতি দেখছে তাকে আমরা বলব observer (দর্শক, পরীক্ষক এই ক্ষেত্রে) এবং যে coordinate system ও ঘড়ি সে ব্যবহার করছে সেটা হবে তার reference frame । Observer এবং frame এই দুটো শব্দের যে কোনো একটি ব্যবহার করা হবে - এই লেখার জন্য তাদের মানে এক।

এইবার second law এর জন্য একটি সতর্কবাণী বলা যাক –

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র, external force F = ma কেবলমাত্র সেই observer (অথবা সেই frame - এ) এর জন্য সত্যি যার জন্য প্রথম সূত্রটা সত্যি।

যে observer (বা frame) এর জন্য বাহ্যিক বল F = ma সেই observer (বা frame) কে বলা যাক inertial observer (বা inertial frame of reference)। নিউটনের প্রথম সূত্র অনুযায়ী inertial frame এর সংজ্ঞা হলো এই: *Inertial frame হল এমন একটা frame যেখানে বাহ্যিক বল না থাকলে গতির কোনো পরিবর্তন হয় না।*

এবার একটা উদাহরণ সাহায্যে এই তথ্যগুলি বোঝা যাক। মাটির উপর রাখা আছে একটা M ভরের টেবিল। তার উপরটা অত্যন্ত মসৃন (smooth)। টেবিলের উপর রাখা আছে একটা m ভরের বাক্স। বাক্সের তলাটিও মসৃন। তাই টেবিলের সাথে তার কোনো ঘর্ষণ বল নেই। সব কিছু স্থির।

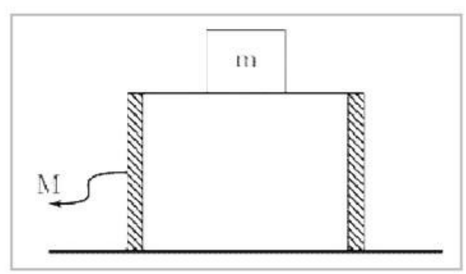

Figure 1

এবার টেবিলের উপর ডানদিকে একটা ধ্রুবক বাহ্যিক বল (constant external force) F প্রয়োগ করা হলো। আমরা দুজন observer (পর্যবেক্ষক) এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরবর্তী ঘটনাগুলি দেখব। Observer A দাঁড়িয়ে আছে মাটিতে - টেবিল থেকে একটু দূরে। বাক্স যদি থাকে টেবিলের মাঝ বরাবর তাহলে A-র অবস্থান-ও তাই। Observer B বসে আছে টেবিলের উপর - টেবিলের এই জায়গাটি থেকে নড়ার উপায় নেই তার।

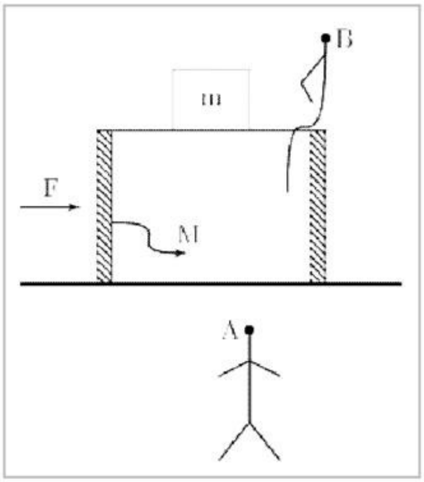

Figure 2

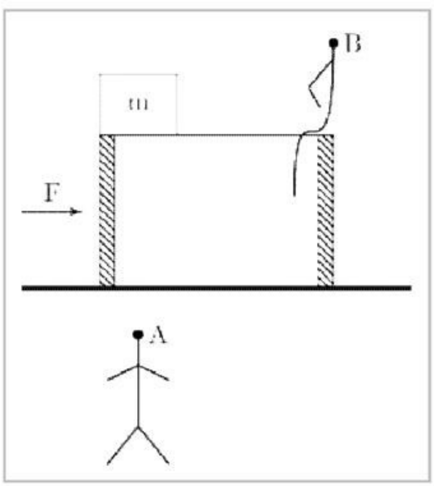

Figure 3

Figure 2-এ এই ব্যাপারটা আমরা দেখছি যে মুহূর্তে বল প্রয়োগ করা হলো সেই মুহূর্তে। একটু পরে কি ঘটবে সেটা figure 3-এ রয়েছে। এবার আমরা A এবং B এর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা করে বিশ্লেষণ করব।

Observer A: A-এর মতে টেবিলের উপর পড়ছে বাহ্যিক বল F। তাই টেবিলের ত্বরণ a = F/M ডানদিকে। Figure 3-এ দেখো, টেবিল ডানদিকে সরেছে। কিন্তু বাক্স আর টেবিলের মধ্যে কোনো ঘর্ষণ বল নেই। তাই বাক্সটির উপর বাহ্যিক বল F-এর কোনো প্রভাব পড়বে না। বাক্সটি যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। তার কোনো স্থান পরিবর্তন হবে না। Figure 3-এর পরের মুহূর্তে বাক্সটি টেবিল থেকে পরে যাবে। নিউটন এর দ্বিতীয় সূত্র টি observer A হুবুহু মেনে চললো - তাই observer A হচ্ছে inertial observer।

Observer B: B চলেছে টেবিলের সঙ্গে - সে কিন্তু নিজের গতিরেখা সম্বন্ধে কিছু জানে না। শুধু দেখবে বাইরেটা ক্রমশ বাঁদিকে সরে যাচ্ছে !আর বাক্সটা ? তার উপর তো কোনো বাহ্যিক বল নেই। অথচ তার ত্বরণ মাপলে B দেখবে বাক্সের ত্বরণ বাঁদিকে a = F/M ! কেন ? নিউটন এর দ্বিতীয় সুত্র B-এর জন্য কেন প্রযোজ্য হলো না A-এর মত ?

এই অমিলের সমাধান :B কে inertial observer বলব না আমরা । কাকে inertial observer বলা যাবে আর কাকে যাবে না, এটা বুঝতে গেলে B -এর

উপর মনোনিবেশ করা যাক। লক্ষনীয়, একজন inertial observer (A) এর কাছে B-এর ত্বরণ আছে। অতএব ধরে নেওয়া যাক, একটা inertial frame এর দৃষ্টিতে একটা observer (বা frame) -এর যদি ত্বরণ থাকে, তাহলে সেই observer কে non-inertial বলা হবে। F = ma এই মর্মে নিউটন এর দ্বিতীয় সুত্র তার জন্য প্রযোজ্য হবে না । এবার প্রশ্ন একটি : একজন non-inertial observer যে **a** ত্বরণে চলেছে নিউটনের দ্বিতীয় সুত্র কিভাবে লিখবে ? (এখানে **a** কে স্থূল হরফ-এ লেখা হলো কারণ ত্বরণ-এর মান ও দিক দুটোই আছে -এটি একটি ভেক্টর ।)

এই প্রশ্নটির উত্তরে non-inertial observer বলবে তার নিজের ত্বরণের জন্য প্রত্যেকটি বস্তুর উপর একটি বল F_p কাজ করছে, যাকে সে লিখবে

$$F_p = -ma \qquad (2)$$

হিসাবে, যদি বস্তুটির ভর হয় m। এই subscript p টা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে F_p সত্যিকারের বল নয়। তবে এই বলটিকে non-inertial observer কে ধরতে হবে যদি তাকে নিউটন এর দ্বিতীয় সুত্র লিখতে হয়। এই বলকে তাই আমরা বলব ছদ্মবল বা Pseudo force। তাই একজন Non-inertial observer নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র লিখবে এইরকম,

$$m\frac{dv}{dt} = F + F_p \qquad (3)$$

এবার আবার Fig. (2) এবং Fig. (3) Observer B-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যাক। B দেখবে m এর উপর কোনো বাহ্যিক বল (external force) নেই। কিন্তু তার নিজের ত্বরণের জন্য সে বাক্সটির জন্য নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র লিখবে

$$m\frac{dv}{dt} = -ma = -\frac{mF}{M} \qquad (4)$$

অর্থাৎ, বাক্সটির ত্বরণ সে দেখবে F/M বাঁদিকে । এই dynamics-টাই Fig (2) এবং Fig (3)-এ B-এর চোখে ধরা পড়ছে।

এইবার ধরা যাক টেবিল ও বাক্সের মধ্যে ঘর্ষণবল (friction force) রয়েছে। টেবিলটিকে ঠেললে পরে টেবিল বাক্সের তলা দিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু ঘর্ষণ (friction) থাকায় এই প্রচেষ্টায় বাধা আসবে। তাই বাক্স টেবিলের ওপর ঘর্ষণবল (f_r) প্রয়োগ করবে বাঁদিকে - যে দিকে টেবিল যেতে চায় তার উলটো দিকে। এবার যদি টেবিলের উপরে বাহ্যিক বল গুলি (ডাইনে ও বাঁয়ে) আঁকা যায় তাহলে ছবিটি হবে

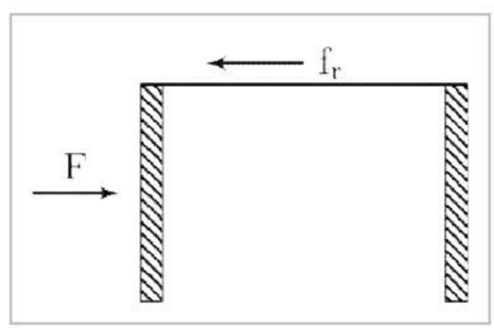

Figure 4

এবং যদি টেবিলটি ডান দিকে চলতে পারে, তাহলে

$$F - f_r = Ma \quad (5)$$

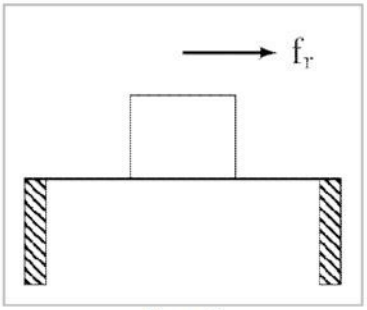

Figure 5

যেখানে 'a' হচ্ছে টেবিল এর ত্বরণের মান।

বাক্সটির কি হবে? তার ওপর নিউটনের তৃতীয় সুত্র অনুযায়ী f_r force কাজ করবে ডাইনে (equal and opposite) যদি একই সঙ্গে টেবিল ও বাক্স চলে তাহলে (টেবিল ও বাক্সের ত্বরণ সমান),

$$f_r = ma \quad (6)$$

Eqs. (5) এবং (6) যোগ করলে,

$$F = (M + m)a \quad (7)$$

অর্থাত্ কিনা system টা একটিই বস্তুর মত ব্যবহার করছে যার ভর $M + m$ ।

কিন্তু বাক্স ও টেবিলের মধ্যে friction এবং একটি সর্বোচ্চ মান আছে। Maximum friction হচ্ছে $f_r = \mu N$ যেখানে *N* হচ্ছে বস্তুটির উপর normal reaction. যেহেতু উপরের দিকে বাক্সটির কোনো গতি নেই, $N = mg$ এবং

$$Max\ f_r = \mu N = \mu mg \quad (8)$$

Eqs. (6) এবং (7) ব্যবহার করলে

$$Max\ f_r = m.Max\ a = \frac{m}{m+M}.F_{max}$$

অথবা,

$$F_{max} = \mu(m + M)g \quad (9)$$

এর মানে কি? ধরা যাক F force টি F_{max} এর চেয়ে বড়, $F = F_{max} + \Delta F$. তাহলে Eq. (5) এর চেহারা হবে,

$$F_{max} + \Delta F - Max\ f_r = Ma \quad (10)$$

Eqs. (8) এবং (9) এর সাহায্যে,

$$\mu Mg + \Delta F = Ma$$

অথবা,

$$a = \mu g + \frac{\Delta F}{M} \quad (11)$$

বাক্সের ত্বরণ কত? তার উপর friction force maximum হওয়ার পর আর বাড়তে পারবে না, তাই $a_{box} = \mu g$ (Eqs.(6) এবং (8) দেখ) । এবার $F > F_{max}$ হলে $a_{table} > a_{box}$ এবং বাক্সটি পিছিয়ে পড়বে টেবিলের অনুপাতে এবং বাঁদিক দিয়ে পড়ে যাবে। তাই friction এর বলে প্রথমে ($F < F_{max}$) বাক্সটির টেবিলের সঙ্গে এগোবে এবং তারপর (আপাতদৃষ্টিতে) বাঁদিকে চলতে থাকবে এবং পড়ে যাবে।

এবার observer B কি দেখবে? যতখন $F \leq F_{max}$, B দেখবে বাক্সটি ঠিক যেখানে ছিল সেখনেই রয়েছে।

যখন $F = F_{max} + \Delta F$, তখন সে দেখবে বাক্সের উপর দুটি বল,

একটি ma বাঁদিকে এবং অন্যটি $Max\ f_r = \mu mg$ ডান দিকে। Eq.(11) অনুযায়ী 'a' ধরা হলে B পাবে

$$m\frac{dv}{dt} = \mu mg - ma = \mu mg - m\left(\mu g + \frac{\Delta F}{M}\right)$$

অথবা,

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{\Delta F}{M} \qquad (12)$$

বাক্সটি $\Delta F/M$ ত্বরণ (acceleration) নিয়ে বাঁদিকে গিয়ে টেবিল থেকে পড়ে যাবে।

এর পর আসা যাক বৃত্তের উপর সমান গতিতে চলার বিশ্লেষণে। গতির মান অপরিবর্তিত থাকলেও তার দিশা সমানে বদলাচ্ছে – এর ফলে তার রয়েছে ত্বরণ (acceleration)। এই ত্বরণ এর মান v^2/R। এখানে v হল গতিবেগের (velocity) মান ও R বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং ত্বরণের দিক বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুর (center এর) দিকে। এই ত্বরণকে বলে centripetal acceleration। এই ত্বরণের মান জ্যামিতির সাহায্যে নির্ণয় করা যায়, acceleration = $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$ মাথায় রেখে।

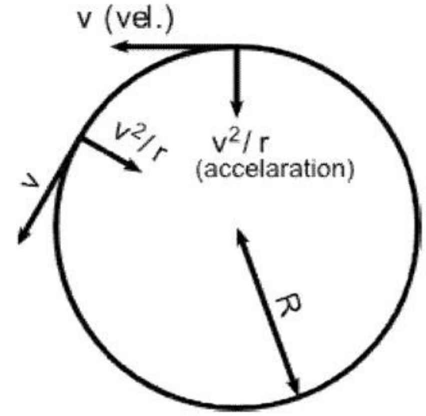

Figure 6

উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যায় পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার ব্যাপারটা (Fig. 7)। বাইরে অবিস্থিত পর্যবেক্ষক (Observer) A দেখবে পৃথিবীর গতিবেগ (velocity) v এবং ত্বরণ (acceleration) v^2/R। Newton-এর দ্বিতীয় সূত্র (second law) হিসেবে সে লিখবে (radius বা ব্যাসার্ধ বরাবর),

$$F_{grav} = \frac{mv^2}{R} \qquad (13)$$

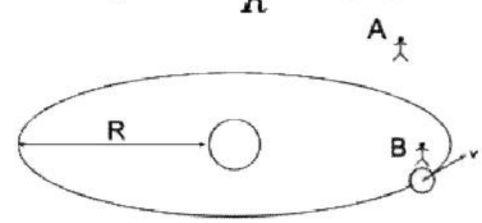

Figure 7

যেখানে F_{grav} হচ্ছে পৃথিবীর ওপর সূর্যের মহাকর্ষীয় বল। Newton – এর সূত্র অনুযায়ী যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে এই বল বিদ্যমান। বস্তু দুটি যদি গোলাকার (spherical) হয় এবং তাদের ভর যদি হয় m1 এবং m2 আর গোলক (Sphere)-দুটির কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যে দূরত্ব হয় R, তাহলে এই বলটির মান $\frac{Gm_1m_2}{R^2}$ এবং তার দিশা যে সরলরেখা কেন্দ্রবিন্দু দুটির মধ্যে দিয়ে গেছে সেই সরলরেখা বরাবর। একটি গোলক অন্যটিকে

আকর্ষণ করে। G - কে বলে Gravitational constant বা মহাকর্ষীয় ধ্রুবক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মধ্যাকর্ষণ বলের সমীকরণে যে mass (ভর) আসে তাকে বলে gravitational mass বা মহাকর্ষীয় ভর । এর আগে আমরা দেখেছি inertial mass । এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের যে inertial mass এবং gravitational mass সমান।

এইবার দেখা যাক পর্যবেক্ষক B কি বলবে। B দেখছে পৃথিবী স্থির। সে একজন non inertial observer (rotating observer)। সে পৃথিবীর উপর দুটি বল আছে মনে করবে - একটি Newton-এর gravitational force F_{grav} যেটি সূর্যের দিকে, অন্যটি আমাদের Eq.(2) -এর pseudo force। এইবার $a = v^2/R$ এবং সূর্যের দিকে -- তাই pseudo force টি mv^2/R এবং বাইরের দিকে। Observer B বলবে,

$$F_{grav} - \frac{mv^2}{R} = 0 \qquad (14)$$

কারণ পৃথিবী তার কাছে স্থির। পর্যবেক্ষক A এবং পর্যবেক্ষক B -এর সিদ্ধান্ত (conclusion) এক:

$$F_{grav} = \frac{mv^2}{R}$$

কিন্তু তাদের বিশ্লেষণ আলাদা।

বৃত্তের উপর ধ্রুবগতিতে চলমান Observer-এর গতিবেগের মান যদি হয় v এবং বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি হয় R তাহলে এই non-inertial observer বলবে যে কোন ভর m-এর বস্তুর উপর একটি pseudo force রয়েছে যার মান mv^2/R , যার দিক ব্যাসার্ধ বরাবর এবং কেন্দ্রবিন্দু থেকে বাইরের দিকে। এই বলকে বলা হয় centrifugal force, যার অস্তিত্ব কেবল non inertial frame-এ ঘূর্ণায়মান পর্যবেক্ষকের (Rotating observer) জন্য।

এবার কল্পনা করা যাক একটি rotating platform, merry-go-round-এ বা নাগরদোলায় যেরকম থাকে, গ্রামোফোনে যেরকম থাকতো বা microwave oven-এ যেরকম থাকে। Platformটির ঘূর্ণনবেগ (rotational speed) ω এবং ঘোরার axis (অক্ষ) -টা vertical axis (Fig.8)। একজন পর্যবেক্ষক A দাঁড়িয়ে আছে platform-এর বাইরে, অন্যজন B platform-এর ওপর কেন্দ্রবিন্দু থেকে r দূরত্বে। একটি পাথর রয়েছে platform-এর ওপর। পাথরের ভর m, তার দূরত্বও কেন্দ্র থেকে r এবং পাথর ও platform-এর মধ্যে রয়েছে friction (ঘর্ষণ বল)।

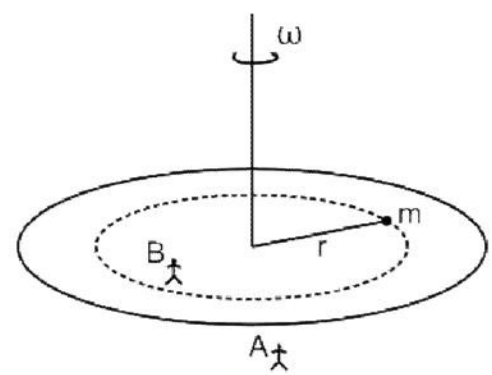

Figure 8

Observer A (inertial): সে দেখছে পাথরটি প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে ঘুরে যাচ্ছে। তাই পাথরের Speed (দ্রুতি) $v = \omega r$ এবং পাথরটি r ব্যাসার্ধের বৃত্তের উপর এই constant speed-এ চলছে। অতএব তার ত্বরণ বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে, ব্যাসার্ধ বরাবর, এবং তার মান $v^2/r = \omega^2 r$ । এখানে বাহ্যিক

বল (External force) কে? তা হল Friction f_r । নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র এই Observer লিখবে এইভাবে,

$$f_r = m\omega^2 r \qquad (15)$$

Observer B (Rotating, non-inertial): B বলবে পাথরটি অচল। External Force রয়েছে -friction, বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে (Eq. (15) দেখ) । এর সঙ্গে জুড়বে Pseudo force এই ক্ষেত্রে Centrifugal force $mv^2/r = m\omega^2 r$ যা কিনা বহির্মুখী। সে নিউটনের সূত্র লিখবে,

$$f_r - m\omega^2 r = 0 \qquad (16)$$

একই উত্তর কিন্তু যুক্তি (argument) সম্পূর্ণ আলাদা।

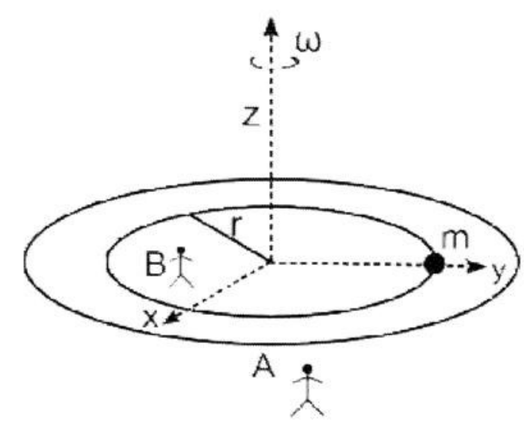

Figure 9

এবার ধরা যাক **friction** নেই। Rotating platform-টি পাথরের তলা দিয়ে নির্বিঘ্নে ঘুরে যাবে। পাথরের সঙ্গে তার কোন ঘষা লাগবে না। যে মুহূর্তে Platform ঘুরতে শুরু করল তখনকার অবস্থা Fig. 9-এ দেখানো হল। এখানে x, y, z অক্ষ দিয়ে তৈরী coordinate system আঁকা হল। Platform-টি z=0 তল (plane)-এ অবস্থিত। অর্থাৎ platform-টি x-y তলে রয়েছে। যে মুহূর্তে ঘূর্ণন শুরু হল তখন Observer B-এর position (r, 0) এবং পাথরের position (0, r) [x-y তলে একটি বিন্দুর co-ordinate হল (x, y)]

Observer A: প্ল্যাটফর্ম ঘুরছে কিন্তু পাথর একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছে -তার উপর কোন বাহ্যিক বল নেই, তার কোন ত্বরণ-ও নেই। B যে কিনা প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে লাগা সে প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে ঘুরবে এবং পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খাবে $\pi/2\omega$ সময় পরে। (m এবং B-এর মধ্যে কৌণিক দূরত্ব (angular distance) $\pi/2$, সেটা অতিক্রম করতে সময় লাগবে $\pi/2\omega$)।

Observer B: নিজের গতি বোঝার উপায় নেই B-এর। সে দেখবে পাথর এসে তার সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে $\pi/2\omega$ সময় পরে। বিশ্লেষণ করতে হবে এটা কি করে সম্ভব। কোনো সত্যিকারের external force পাথরের ওপর নেই। B non inertial observer (rotating) - সে পাথরের ওপর pseudo force দেখবে। যে pseudo force-এর কথা আমরা শিখেছি সেটা হল centrifugal force। বৃত্তের ওপর চলমান পর্যবেক্ষকের জন্য এই বল ব্যাসার্ধ বরাবর বহির্মুখী ও তার মান $m\omega^2 r$ । ভেক্টরের সঙ্কেতে (Vector notations)-এ লিখলে,

$$\mathbf{F}_{\mathbf{centrifugal}} = m\omega^2\mathbf{r} = m\omega^2[x\hat{i} + y\hat{j}] \qquad (17)$$

(আগের মতই ভেক্টর রাশিকে মোটা অক্ষরে লেখা হচ্ছে।)

$\hat{i}$ এবং $\hat{j}$, x এবং y-অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর (unit vectors)। এই বল তো পাথরটিকে ঠেলে বৃত্ত থেকে বার করে দেবে , পাথর তো ঘুরে B'র দিকে আসবে না। এর মানে ঘূর্ণায়মান পর্যবেক্ষক (Rotating observer) centrifugal force ছাড়াও আরোও ছদ্ম বল (pseudo force) দেখবে। এই বল হতে হবে tangential direction-এ– নইলে পাথর B'র দিকে আসতে পারবে না। এই ক্ষেত্রে শুধু tangential নয় ঘড়ির কাঁটার দিক বরাবর-ও হতে হবে। বলা বহুল্য বল'টি ω=0 হলে থাকতে পারে না। তাই নিশ্চই ω-এর সমানুপাতিক। আগের উদাহরণ থেকে দেখাই বেগ যখন শূন্য তখন এই বল'টিও শূন্য। ঘর্ষণের জন্য পাথর যখন স্থির ছিল তখন এই বল ছিল না। centrifugal force-এর জন্য radial velocity তৈরী হলে তবে এই tangential force-টি আসবে। ω (z-বরাবর)

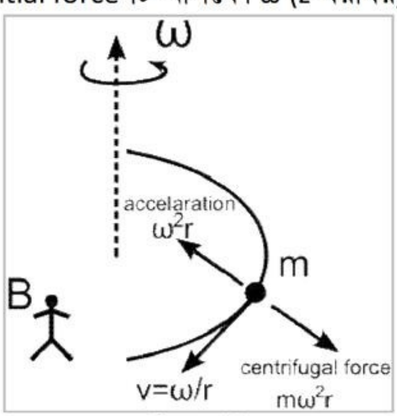

Figure 10

এবং **v** vector-এর ওপর নির্ভরশীল এই বল-টাকে ভাঙা যেতে পারে m(**v** x **ω**) [তাহলে clockwise tangential component থাকবে এবং dimension মিলবে [কিন্তু coefficient-এ যে কোনো একটি সংখ্যা বসতে পারে। সত্যিকারের হিসেব ছাড়া এই বলটির ঠিক রূপ লেখা সম্ভব নয়। আমরা যে পথে এগিয়েছি সেটা কিছুটা intuitive । যাই হোক , এই রাস্তা ধরে এগোলে coefficient-টাও বেরিয়ে আসবে। ধরা যাক coefficient-টি α, তাই বলটাকে লেখা হল m α(**v** x **ω**)। এটায় পর্যবেক্ষক B কি দেখবে ? পর্যবেক্ষক B দেখবে পাথরটি তার দিকে এগিয়ে আসছে r ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি ধরে (along a circle of radius r)।

তাহলে পর্যবেক্ষক B বলবে পাথরের ত্বরণ $\omega^2 r$ কারণ পাথরের গতিবেগের মান v = ωr। সমস্ত গতি এখানে ঘুর্ণনবেগ ω-এর জন্য। এই ত্বরণ কেন্দ্রবিন্দুর দিকে। B এখন পর্যন্ত জানে পাথরের ওপর centrifugal force আছে $m\omega^2 r$ বাইরের দিকে। নতুন যে force-টির কথা হচ্ছে সেটাকে হতে হবে তাহলে কেন্দ্রবিন্দুর দিকে - cross product rule-এর সাহায্যে সহজেই বোঝা যাচ্ছে **v** x **ω** কেন্দ্রের দিকে। তাহলে কেন্দ্রাভিমুখ বল (force towards the center) αm (**v** x **ω**) = $\alpha m\omega^2 r$ এবং অপকেন্দ্রিক বল) force away from the center) $m\omega^2 r$ । নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র হিসেবে B লিখবে $\alpha m\omega^2 r - m\omega^2 r$ = ভর x ত্বরণ = $m\omega^2 r$, অতএব আমরা পাচ্ছি , α= 2।

Rotating frame of reference-এ যে এই নতুন pseudo force-টা পাওয়া গেল, তার নাম **কোরিওলিস বল** (Coriolis force),

$$\mathbf{F}_{coriolis} = 2m\mathbf{v} \times \boldsymbol{\omega} \qquad (18)$$

ঘূর্ণায়মান পর্যবেক্ষক ω constant (ধ্রুব) হলে এই দুটি pseudo force দেখে (centrifugal + coriolis)। যদি ω বদলায় তাহলে একটি তৃতীয় pseudo force তৈরী হয়। তাই আমাদের উদাহরণের পর্যবেক্ষক B Newton’s second law লিখবে (vector notations-এ)

$$m(d\mathbf{v}/dt) = m\omega^2\mathbf{r} + \mathbf{F}_{ext} + 2m(\mathbf{v}\times\boldsymbol{\omega}) \quad (19)$$

যদি দ্বিমাত্রিক গতি হয় তাহলে ,

$$\hat{r} = x\hat{i} + y\hat{j}, \quad \mathbf{v} = \dot{x}\hat{i} + \dot{y}\hat{j}, \quad \dot{\mathbf{v}} = \ddot{x}\hat{i} + \ddot{y}\hat{j}$$

এইবার আমরা এই সমীকরণ-টা ধরে নিয়ে পর্যবেক্ষক B’র জন্য সত্যি সত্যিই অঙ্ক কষে দেখাব যে পাথরের গতিপথ B’র চোখে একটি বৃত্তাকার পথ। এই ক্ষেত্রে $F_{ext} = 0$ এবং উপাদান-এ ভেঙে নিয়ে লিখলে Eq (19) হবে,

$$\ddot{x} = 2\omega\dot{y} + \omega^2 x \quad (20a)$$

$$\ddot{y} = -2\omega\dot{x} + \omega^2 y \quad (20b)$$

এই দুটি সমীকরণ-এর সমাধানের জন্য $z = x + iy$ ব্যবহার করা হয় ($i = \sqrt{-1}$) সহজেই দেখা যায় ,

$$\ddot{z} + 2i\omega\dot{z} - \omega^2 z = 0 \quad (21)$$

Second order differential equations with constant coefficient-এর সমাধানের চেহারা হয় $e^{\lambda t}$, তাই $z = A\, e^{\lambda t}$ লিখলে (যেখানে *A* ধ্রুবক),

$$\lambda^2 + 2i\omega\lambda - \omega^2 = (\lambda + i\omega)^2 = 0 \quad (22)$$

Repeated roots হওয়ায় দুটি independent solutions হবে, $e^{-i\omega t}$ এবং $t\, e^{-i\omega t}$। *C* এবং *D* যদি Constants of integration হয় তাহলে,

$$z(t) = Ce^{-i\omega t} + Dte^{-i\omega t} \quad (23)$$

এবং

$$\dot{z}(t) = -i\omega Ce^{-i\omega t} + De^{-i\omega t} - i\omega Dte^{-i\omega t}$$

এইবার C এবং D নির্ধারণ করতে হবে initial conditions-এর সাহায্যে । পর্যবেক্ষক B দেখবে যখন t = 0 , m-এর অবস্থান) 0, *r*) -এ। তাই $z(t=0) = ir$ আর পাথরের গতিবেগ হিসেবে t = 0 সময়ে সে দেখবে $\dot{y} = -\omega r$ (নিজের গতিবেগের ঠিক উল্টোটা(। তাই $\dot{z}(t=0) = -i\omega r$, Eq (23) থেকে t = 0 সময়ে পাই $C = ir$ এবং $\dot{z}$ – এর যে রূপ)expression) দেওয়া আছে Eq (23) এর নীচে, তার থেকে পাই $D = 0$ । অতএব এই প্রাথমিক শর্ত ব্যবহার করে ,

$$z(t) = ire^{-i\omega t} \quad (24)$$

Real এবং imaginary parts আলাদা করলে,

$$x = r\sin\omega t, \quad y = r\cos\omega t \quad (25)$$

$t = \pi/2\omega$ সময়ে $x = r$ এবং $y = 0$, তাই B দেখবে পাথরটি এসে তার সঙ্গে ধাক্কা খেলো। Eq (25) B-এর চোখে পাথরটির গতি সম্পূর্ণ রূপে দিয়ে দিচ্ছে । একটু ভাবলেই বোঝা যাবে উত্তরটা সম্পূর্ণ সত্যি। এটাও এবার খুব সহজে বুঝে নিতে পারবে

যে Eq (18)-এ 2 ছাড়া অন্য কোনো prefactor বেরোলে অবাস্তব উত্তর আসতো।

এতটা সময় কেন ঘূর্ণায়মান পর্যবেক্ষকের ওপর কাটালাম? পৃথিবীর নিজের অক্ষের ঘূর্ণনের জন্য আমরা সবাই ঘূর্ণায়মান পর্যবেক্ষক! 24 ঘন্টায় 2π radian ঘোরাটা খুবই অল্প ঘূর্ণন বেগ। কিন্তু যখন হাওয়ায় গতি এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রয়োজন তখন এই Coriolis force কে বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে।

Non inertial frame-এর আরেকটি সহজ উদাহরণ ধ্রুব মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে (constant gravitational field) পাওয়া যায়। পৃথিবীর উপরিতলের (surface) কাছাকাছি থাকলে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রটা (gravitational field) একটা ধ্রুবক ত্বরণ (constant acceleration) তৈরী করে যেটা আমরা "g" হিসেবে লিখি। যে কোনে বস্তু যার ভর "m", সে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুর দিকে আকৃষ্ট হবেই একটি বল mg দিয়ে। পর্যবেক্ষক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে সে দেখবে প্রত্যেকটা বস্তুর ওপর বলটা উল্লম্বভাবে নিচের দিক (vertically downwards)। এবার আমরা বলতেই পারি যদি মহাকর্ষীয় ভর (gravitational mass) এবং জাড্য ভর (inertial mass) সমান হয় তাহলে এমন একটি reference frame যদি নেওয়া যায় যেটি "g" ত্বরণ (acceleration) নিয়ে নীচের নামছে, সেই frame-এ প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর থাকবে ছদ্ম বল (pseudo force) mg উপরের দিকে এবং সেটা সম্পূর্ণ ভাবে বাতিল (cancel) করে দেবে নিচের দিকে মাধ্যাকর্ষণ বল (gravitational force) mg। এই reference frame-এ মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের (gravitational field) অস্তিত্ব আর বোঝা যাবে না।

নিচের ছবির সাহায্যে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় যেটা পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ধরা যাক পৃথিবীতে কোথাও একটা "h" উচ্চতার tower রয়েছে (Fig 11)। Tower-এর তলা থেকে উপরের দিকে আলো ফেলা হচ্ছে। আলোর কম্পাঙ্ক (frequency) ν। Tower-এর মাথায় রয়েছে একটি receiver।

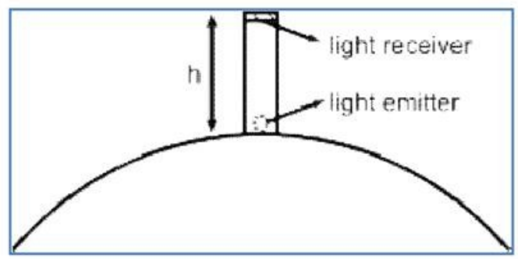

Figure 11

প্রশ্ন: ঐ receiver কি আলোর কম্পাঙ্ক ν-ই দেখবে না অন্য কিছু? হিসেবের সুবিধার জন্য আলোর চরিত্রটা নেব কণাভিত্তিক। আলোর কণা হচ্ছে ফোটন। কোনো উৎস থেকে ν কম্পাঙ্কে আলো বেরোনো মানে T= $1/\nu$ সময় পরপর ফোটন নির্গত হচ্ছে। যে কোনো frame-এ আলোর কণার গতি c = 3×10^8 m/sec।

এবারে পরপর দুটি ফোটন নির্গমণের ঘটনা বিশ্লষণ করা যাক এমন একটি reference frame থেকে যেটি কিনা g ত্বরণ নিয়ে নীচের দিকে পড়ছে। এই frame-এ কোনো মহাকর্ষ নেই । Fig (12)-এ ঘটনাবলীর ছবি দেওয়া হল।

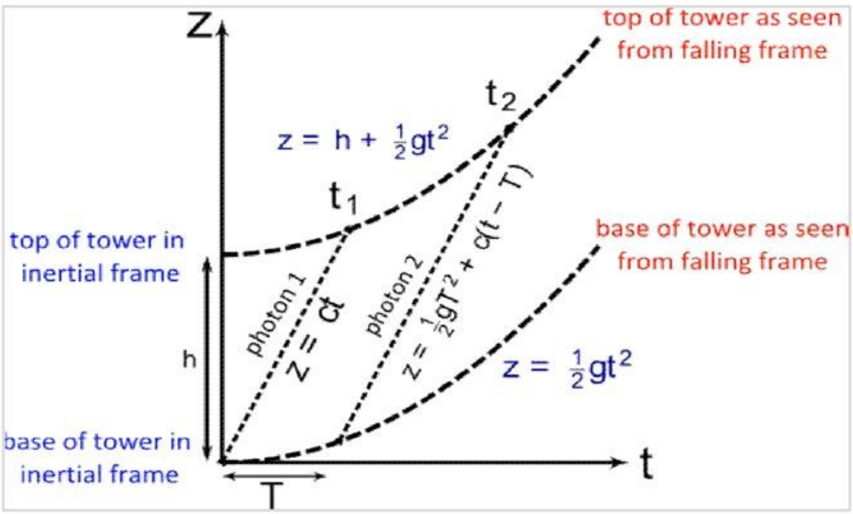

Figure 12

'g' ত্বরণে নেমে যাওয়া পর্যবেক্ষক দেখবে:

1) Tower এর তলদেশের অবস্থান বদলাচ্ছে $z = \frac{1}{2}\, gt^2$ অনুসারে,

2) Tower এর ছাতের অবস্থান বদলাচ্ছে $z = h + \frac{1}{2}\, gt^2$ অনুসারে,

3) প্রথম ফোটন বেরোলে $z = 0$ থেকে $t = 0$ সময়তে। ধ্রুবগতি c -তে চললে অতিক্রান্ত পথ হবে

$$z = ct$$

4) সময় $t = T = 1/\nu$-তে দ্বিতীয় ফোটন বেরোবে, সে চলবে $z = \frac{1}{2}\, gT^2$ থেকে এবং ধ্রুব গতিবেগ c নিয়ে, তার পথ হবে

$$z = \frac{1}{2}\, gT^2 + c(t - T)$$

5) প্রথম ফোটন ছাতে পৌঁছাবে t_1 সময়ে যখন

$$h + \frac{1}{2}\, gt_1^2 = ct_1 \qquad (26)$$

6) দ্বিতীয় ফোটন ছাতে পৌঁছাবে t_2 সময়ে যখন

$$h + \frac{1}{2}\, gt_2^2 = c(t_2 - T) + \frac{1}{2}\, gT^2 \qquad (27)$$

যদি g=0 হয় (কোন ত্বরণ নেই, তাই কোন মহাকর্ষ বলও নেই) তাহলে Eq (26) এবং (27) থেকে আমরা পাবো

$$t_2 - t_1 = T$$

যদি $g \neq 0$ হয় তাহলে (27) থেকে (26) বিয়োগ করলে

$$\frac{1}{2}\, g(t_2^2 - t_1^2) = c(t_2 - t_1) - cT + \frac{1}{2}\, gT^2 \qquad (28)$$

Eq (26) এবং (27) যোগ করলে

$$c(t_1 + t_2) = cT - \frac{1}{2}\, gT^2 + 2h + \frac{1}{2}\, g(t_2^2 + t_1^2) \qquad (29)$$

যেহেতু $t_1 \simeq h/c$

এবং $t_2 \simeq h/c + T \simeq h/c$

($h \gg \lambda$ = আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য)

$$\frac{g}{2}(t_1^2 + t_2^2) \simeq \frac{gh^2}{c^2} \ll h \ , \ gT \ll c.$$

Eq (29) থেকে আমরা পাই $t_1 + t_2 \simeq 2h/c$

এবং Eq (28) হয়ে দাঁড়ায়

$$c(t_2 - t_1)\left[1 - \frac{gh}{c^2}\right] \simeq cT$$

অথবা,

$$t_2 - t_1 = \frac{T}{1 - gh/c^2} \simeq T\left(1 + \frac{gh}{c^2}\right) \qquad (30)$$

যে আলো পৌঁছেছে Tower-র ওপর তার কম্পাঙ্ক

$$\nu\,' = \frac{1}{t_2 - t_1} \simeq \nu\left[1 - \frac{gh}{c^2}\right].$$

অতএব মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে (gravitational field) আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বদলে যায় - আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের তিনটি বড় ভবিষ্যদ্বাণীর একটি। 1959 সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিখ্যাত পরীক্ষায় পাউন্ড এবং রেবকা 22.5m উঁচু একটা tower ব্যবহার করে এই ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র প্রভাব ($gh/c^2 \simeq 2 \times 10^{-15}$!!) গবেষণাগারে প্রদর্শন করেন। এটা সহজেই অনুমান করতে পারবে কি ধরণের ভয়ানক চিন্তাশক্তি ও সৃজনশক্তির সাহায্যে এত ছোট একটি প্রভাব ধরা গিয়েছিল!

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2014/02/28/jkb/

ফোর্স ডায়াগ্রাম: শুভায়ু আলি

অধ্যাপক জয়ন্ত ভট্টাচার্য এলাহাবাদের হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পদার্থবিজ্ঞানী এবং অধিকর্তা। গবেষণার বিষয় স্ট্যাটিস্টিকাল মেকানিক্স, নন-লিনিয়ার ডাইনামিক্স, টারবুলেন্স ইত্যাদি। পড়াশোনা করেছেন কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মেরীল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যাপনা করেছেন IIT কানপুর, IACS (কলকাতা) ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু মৌল বিজ্ঞান কেন্দ্রে (SNBNCBS)

পাঠকের দরবার - নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে কি তৃতীয় সূত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়?

‘বিজ্ঞান’-এর পাঠকদের কাছ থেকে পাওয়া প্রশ্ন থেকে বাছাই করা কিছু প্রশ্ন নিয়ে ‘পাঠকের দরবার’। সম্পাদনায় সুমন্ত্র সরকার। তীর্থ মন্ডল ও সমীর সানার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এলাহাবাদের হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক জয়ন্ত ভট্টাচার্য

নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে প্রথম গতিসূত্র প্রমাণ কর, বা দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে তৃতীয় গতিসূত্র প্রমাণ কর - এমন প্রশ্ন বিভিন্ন স্কুলের পরীক্ষায় এমনকি সরকারি বোর্ডের পরীক্ষায় এসে থাকে। প্রশ্নগুলো যদি নিছক ছাত্রছাত্রীদের যাচাই করার জন্য হয়ে থাকে তাহলে সেটা অন্য বিষয়।

শুধু নিউটনের প্রথম ও দ্বিতীয় গতিসূত্র ব্যবহার করে তৃতীয় গতিসূত্রকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সরলরৈখিক চলনের একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

ধরা যাক একক ভরের একটা বল (ball) A একটা রেখার একপ্রান্তে স্থিরভাবে রাখা আছে। একদম একইরকম আরেকটা বল B, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যেতে যেতে v বেগ নিয়ে A বলটাকে ধাক্কা মারলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধাক্কার পরে A আর B এর গতিবেগ কত?

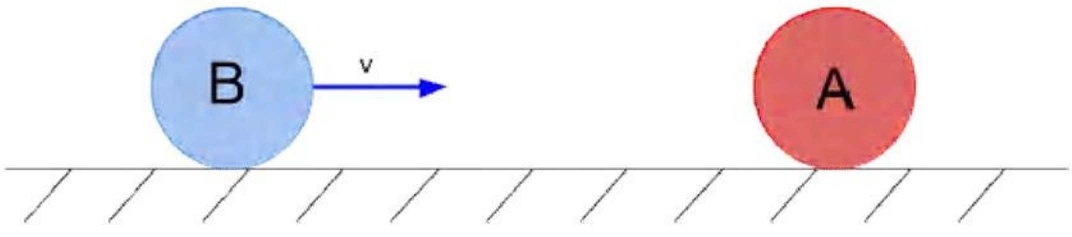

প্রথমে এই সমস্যাটার সমাধান কেবলমাত্র শক্তি সংরক্ষণ আর নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র দিয়ে করি। (অর্থাৎ, ধরা যাক ভরবেগ যে সংরক্ষিত সে ব্যাপারটা আমরা জানি না।) আরও ধরা যাক যে ধাক্কা লাগার ঘটনাটা খুব তাড়াতাড়ি, T সময়ের মধ্যে ঘটে।

নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুসারে কোনো বস্তুতে বলের পরিমাণ, ওই বস্তুর ভরবেগ পরিবর্তনের সমান। তাই যদি ধাক্কা লাগার পর A এর গতিবেগ V_a আর B এর গতিবেগ V_b হয়, তাহলে A এর উপরে বলের (Force) পরিমান $F_A = m(V_a-0)/T = mV_a/T$ আর B-এর উপরে বলের পরিমান $F_b = m(V_b - V)/T$। দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে এর বেশী

আর কিছু জানা যায় না। তবে শক্তি সংরক্ষণের সূত্র, অর্থাৎ $V_a^2 + V_b^2 = V^2$ ব্যবহার করলে A আর B এর গতিবেগ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়। শক্তি সংরক্ষণের সূত্র বলে যে A আর B এর শেষ গতিবেগ V এর বেশি হতে পারবে না আর ওদের গতিবেগের বর্গের যোগফল V^2 এর সমান হতে হবে। অর্থাৎ ($V_a = \pm V/2$, $V_b = \pm \sqrt{3}\, V/2$), ($\pm V/\sqrt{2}$, $\pm V/\sqrt{2}$), (0, $\pm$ V), ($\pm$ V, 0), এগুলো সবই সম্ভাব্য সমাধান। কিন্তু এইসমস্ত সমাধানগুলোর মধ্যে কেবল একটাই সঠিক সমাধান আর সেটা জানতে দ্বিতীয় গতিসূত্রের সাথে সাথে তৃতীয় গতিসূত্রও ব্যবহার করতে হবে। যদি দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে তৃতীয় গতিসূত্র পাওয়া যেত, তাহলে আমরা কেবল দ্বিতীয় গতিসূত্র ব্যবহার করেই এই সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারতাম।

শুধু নিউটনের প্রথম ও দ্বিতীয় গতিসূত্র ব্যবহার করে তৃতীয় গতিসূত্রকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

তৃতীয় গতিসূত্র বলে যে এই দুই বলের পরিমান সমান এবং এদের অভিমুখ একে অপরের বিপরীত দিকে। তাই অংকের ভাষায়, $F_A = - F_B$ । এবার এই সমীকরণটার সমাধান করে আমরা পাই

$$V_a + V_b = V$$

এই সমীকরণটা ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই শক্তি সংরক্ষণ আর ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্রের সমীকরণ দুটো সমাধান করে পাই $V_a = 0$, $V_b = V$ অথবা $V_a = V$, $V_b = 0$। খেয়াল করে দেখো, প্রথম সমাধানটা ধাক্কা লাগার আগের অবস্থা, তাই ধাক্কা লাগার পরে A এর গতিবেগ হবে V আর B এর গতিবেগ হবে শূন্য।

একইরকম ভাবে নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে প্রথম গতিসূত্র পাওয়া যায় না। প্রথম গতিসূত্র সব রেফারেন্স ফ্রেমে খাটে না। কিছু রেফারেন্স ফ্রেমে খাটে। তাহলে নিউটনের প্রথম সূত্র খাটে বা খাটে না এর উপর ভিত্তি করে রেফারেন্স ফ্রেম-কে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র কেবল সেই ফ্রেমেই খাটে যেখানে প্রথম সূত্র খাটে।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2016/05/16/pathak3_newton_3rd_law_from_2nd/

সৌরশক্তির যাদু : কম ভোল্টেজে

শেখর ব্যানার্জী

ইলেক্ট্রনিক্স বিশেষজ্ঞ ও স্বনিযুক্ত গবেষক, যতিন দাস পার্ক, কলকাতা

ও

পার্থসারথি মজুমদার

অধ্যাপক, ভৌতবিজ্ঞান বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বেলুড়

ঘরে আলো

প্রচলিত ভূমিজ-পদার্থভিত্তিক (fossil fuel) শক্তির ক্ষেত্রে অধুনা একদিকে চাহিদার মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার ফলে দাম বাড়তে বাড়তে আকাশছোঁয়া, অন্যদিকে প্রয়োজন মেটাবার মত শক্তিই বা কোথায়? অথচ সাধারণ মানুষের জীবনে শক্তি ছাড়া চলে না। একদিকে গৃহস্থালীর নানাবিধ আধুনিক যন্ত্রপাতি চালাবার জন্যে বিদ্যুৎ শক্তির আশু প্রয়োজন; অন্যদিকে শিল্প-কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনেক শক্তির ভীষণ দরকার। শক্তির এই বিপুল ঘাটতি কমাতে আমাদের সরকার বিরাট অর্থব্যয়ে পেট্রোলিয়াম আমদানী করে চলেছে, কিন্তু এই ভাবেই কি চলবে? বিশেষত যখন এই গরম দেশে রোদ-হাওয়ার অভাব নেই। আমাদের মত রৌদ্রস্নাত দেশে তাই সৌরশক্তি সম্বন্ধে গবেষণা ও সেই শক্তির ঠিকমত ব্যবহার যাতে আম-জনতা করতে পারে সেটা অত্যন্ত জরুরী। এ-ব্যাপারে আমরা বাড়ীতে সম্পূর্ণ নিজেদের সামর্থে যা করতে পারি, এই প্রতিবেদনে তা রাখছি।

প্রথমে, যে-সব জায়গায় সরকারী বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি রয়েছে, সে-সব জায়গায় কিভাবে সৌর-শক্তির সাহায্যে আলোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে, সে ব্যাপারে বলি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সৌরপ্যানেল থেকে উৎপন্ন সৌরবিদ্যুৎ দিয়ে জোরদার একটি বড়সড় মাপের ব্যাটারী চার্জ (বা আধানযুক্ত) করা হয়। কিন্তু ব্যাটারীর বিদ্যুৎ DC হওয়ার কারণে সেটা আমাদের গৃহস্থালীর 220 Volts AC বিদ্যুৎ-চালিত যন্তের পক্ষে উপযুক্ত নয়। সেটা পেতে দরকার একটি ইনভার্টার (inverter) যন্ত্রের, যা 12 volts DC বিদ্যুৎ কে 220 volts AC তে রুপান্তরিত করতে পারে। কিন্তু এটা খানিক খরচ-সাপেক্ষ, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত কম আর্থিক সামর্থের পরিবারের জন্য। আরও মনে রাখা দরকার যে 220 volts AC মোটেই সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়, বিশেষ করে আমাদের দেশে। রোজই কোথাও না কোথাও থেকে 220 volts AC তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার দুর্ঘটনার খবর আসে।

এদিকে 12 volts 50 Watt (বা আরও কম শক্তিশালী) সৌরপ্যানেল থেকে সরাসরি উৎপন্ন বিদ্যুতের দরুণ তেমন কোন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নেই। এই সব কারণে হয়ত আরেকটা বিকল্প আছে যেটা নেওয়া যেতে পারে। এই বিকল্পে, সৌরপ্যানেল থেকে পাওয়া 12 volts DC বিদ্যুৎ দিয়ে সরাসরি ছোট 12 volts, 7 - 9 Ampere Hour, Lead-Acid ব্যাটারীকে আধানযুক্ত করা চলতে পারে এবং সেই আধানযুক্ত ব্যাটারী দিয়ে 12 volts DC Light Emitting Diode বা LED জ্বালানো চলতেই পারে। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে আলোকসজ্জায় ব্যবহৃত চীনে Warm White LEDর যে মালা বাজারে পাওয়া যায়, তা দিয়ে বড়, ধরুণ, 4×3 বর্গ মিটারের ঘর অনায়াসে আলোকিত করা যায়, প্রায় একটা 40 - 60 Watt বাল্বের মত! এমন একটি আলোকিত ঘরের ছবি আমরা পরে রাখছি, একটা ধারণা দেওয়ার জন্য। ব্যাটারী ঠিকমত আধানযুক্ত হলে, যেটা কড়া রোদে 4 - 5 ঘন্টায় অনায়াসে সম্ভব, এই ধরণের আলো রাতে প্রায় 5 - 6 ঘন্টা জ্বলে বেশ জোরের সঙ্গে, তারপর ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে, ব্যাটারীর আধান কমার সঙ্গে-সঙ্গে। খরচার ব্যাপারে বলতে গেলে যেটা সবচেয়ে বেশী দামী, সেটা হল সৌরপ্যানেল। একটি 12 volts 50 Watt প্যানেলের দাম 2,500 - 3,000 টাকা, ভাল Lead Acid ব্যাটারীর দামও অনুরূপ, চীনে LED'র মালার দাম খুব বেশী হলে 400 - 500। আমাদের হিসেব অনুযায়ী মোটামুটি হাজার ছয়েক টাকার একটা

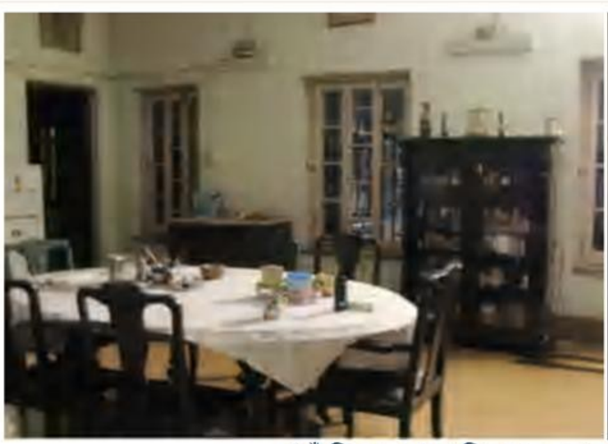

(বাঁ দিকে: আলোকিত ঘর, ডান দিকে: LED মালা ও ব্যাটারী)

প্রারম্ভিক খরচের পর বিনামূল্যে ঘরে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা হয়ে যায়, তা প্রায় বছর দুয়েকের জন্যও তো বটেই। এই ব্যবস্থা কি আমাদের দেশের যে কোন বাড়ীতে অন্ধকার ঘোচাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

> আলোকসজ্জায় ব্যবহৃত চীনে Warm White LED -র যে মালা বাজারে পাওয়া যায়, তা দিয়ে বড়, ধরুণ, 4×3 বর্গ মিটারের ঘর অনায়াসে আলোকিত করা যায়, প্রায় একটা 40 - 60 Watt বাল্বের মত!

জল গরম করা : সস্তায়

আমরা DC heater element নিয়েও কিছু পরীক্ষা করেছি। একটা কালো রঙ করা ধাতুর জলাধার, তার মধ্যে দুটো তার ঢোকানো, যেগুলো 24 volt এর একটা ব্যাটারী প্যাকের (12 volt, 9 Amp/hr এর দুটো ব্যাটারী হতে পারে) সঙ্গে লাগানো। ব্যাটারী প্যাকটি আগে থেকে সৌরশক্তিতে চার্জ করে রাখা যেতে পারে। জলাধারটি 2 লিটার আয়তনের হলে শীতকালেও জল 50 – 60 ডিগ্রী সেলসিয়াস অবধি গরম করতে 20 – 30 মিনিটের বেশী লাগা উচিত নয়। যে-সব জায়গায় বিদ্যুতের ঘাটতি, সেখানে এই সস্তার জল-গরম করার যন্ত্র বিশেষ কাজে দেবে আশা করা যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্রগুলিতে প্রায়ই যখন গরম জলের দরকার হয়, অথচ বিদ্যুতের অভাবে তা সম্ভব হয় না, এই যন্ত্র সেখানে খুবই কাজে আসতে পারে। আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার - এই যন্ত্র ব্যবহারে কোনও কারেন্ট বা শক লাগার বিপদের ভয় নেই, যা 220 volt যন্ত্রে যথেষ্ট রয়েছে।

সুপারক্যাপাসিটর দিয়ে সৌরশক্তি সঞ্চয় ও যানবাহনে ব্যবহার

সাধারণতঃ সৌরশক্তি সঞ্চয় করা হয় ব্যাটারীতে, তাকে চার্জ করার মাধ্যমে। কিন্তু rechargeable ব্যাটারী হলেও সেটা খুব বেশী বার রিচার্জ (recharge) করা যায়না, এবং চার্জ করতেও সময় লাগে অনেক। এর প্রধান কারণ এই যে ব্যাটারীর মধ্যে বৈদ্যুত-রাসায়নিক (electrochemical) পদ্ধতিতে বাইরের বৈদ্যুতিক কারেন্ট দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চিত হয়। এই পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ, এবং বেশীবার ব্যাটারীর শক্তি ফুরিয়ে গেলে তাকে রিচার্জ করলে ব্যাটারী কিন্তু আস্তে আস্তে কমজোরী হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, ব্যাটারী কমজোরী হয়ে গেলে, তাকে যে-কোনও জায়গায় ফেলে দেওয়া যায়না, কারণ ব্যাটারীর মধ্যে যে রাসায়নিক পদার্থগুলি রয়েছে, সেগুলি বিষাক্ত, এবং খাবার জলে ঢুকে গেলে সেগুলো মানুষের ক্ষতি করতে পারে।

এই সব কারণে এর বিকল্প হিসেবে বিদেশে তৈরী হয়েছে 'সুপারক্যাপাসিটর' (supercapacitor) – এক ধরণের ক্যাপাসিটর যার মান সাধারণ ক্যাপাসিটরের তুলনায় অনেক গুণ বেশী। টিভি, অডিও-সিসটেম প্রভৃতি ইলেকট্রনিক যন্ত্রে যে-সব ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়, তাদের মানের তুলনায় এক কোটি থেকে একশো কোটি গুণ বেশী। এগুলি কোন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরী নয়, সাধারণতঃ অঙ্গার (carbon) দিয়ে তৈরী, ন্যানোপ্রযুক্তির (nanotechnology) মাধ্যমে। এই প্রযুক্তিও এমন নয় যে এদেশে তৈরী করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদেশে এই ধরণের ক্যাপাসিটর

পাওয়া যায়না! আমেরিকা, জার্মানী ও চীনদেশে অবশ্যই এগুলি পাওয়া যায়, দরকার হলে সেখান থেকেই আমদানী করতে হয়।

সৌরশক্তি দিয়ে চার্জ করা সুপারক্যাপাসিটর-চালিত ব্যাটারীহীন ট্রেনের model

সৌরশক্তি দিয়ে চার্জ করা সুপারক্যাপাসিটর-চালিত ব্যাটারীহীন সাইকেল-রিক্সার model

এই সুপারক্যাপাসিটরের বহু-বহু প্রয়োগ রয়েছে, এবং অনেকেই মনে করছেন যে ভবিষ্যতে ব্যাটারীর ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতে পারবে এদের আবির্ভাবে। প্রয়োগের মধ্যে একটা হচ্ছে যানবাহনের কাজে। আমরা সুপারক্যাপাসিটরকে সৌরশক্তি সঞ্চয়ের আধার হিসেবে ব্যবহার করে prototype model ট্রাম বা ট্রেন, সাইকেল রিক্সা ও গঙ্গা পারাপার করার ferry boat বানিয়েছি। এগুলি সবই খেলনা মাপের, কিন্তু যে-ভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাতে পূর্ণ মাপের তৈরী করতে কোন বাধা নেই, ইচ্ছে ও খানিকটা অর্থবল ছাড়া, তাও সেটাও শুধু শুরুতে। তারপর প্রকৃতির দানে দৈনন্দিন শক্তিসঞ্চয় ও ব্যবহার নিখরচায়!

সৌরশক্তি দিয়ে চার্জ করা সুপারক্যাপাসিটর-চালিত ব্যাটারীহীন সাইকেল-রিক্সার আমরা সকলেই জানি যে কলকাতা শহর থেকে একটু শহরতলির দিকে গেলেই সাইকেল-রিক্সা বা ভ্যান-রিক্সা ছাড়া কোন যানবাহন নেই। অথচ বছরের বেশীর ভাগ সময়ে গরমে সাইকেল রিক্সা চালকদের কষ্টের সীমা থেকে না। ওপরের ছবিতে আমরা যে খেলনার মডেলটা দেখছি, তার একটা পূর্ণমাপের সংস্করণ কী করা যায়না, যাতে সাইকেল রিক্সা চালানো একটু সহজ হয়? এখন আপনারা শহরতলিতে ‘টো-টো’ বলে একটা নতুন ব্যাটারী-চালিত রিক্সা দেখছেন, যেটা ভালই চলছে। কিন্তু তার যা দাম, তাতে ঐ বাহন কিনতে একজন সাধারণ সাইকেল-রিক্সা চালক ধারের জালে জড়িয়ে যেতে পারেন। তার ওপর, ‘টো-টো’র বেশীর ভাগটা চীন থেকে আমদানী করা, খারাপ হয়ে গেলে ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এর বিকল্প হিসেবে আমরা একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, যাতে দেশে সহজে পাওয়া যায়, এবং সহজে দেশের দোকানে সারানো যায়, এমন একটা সৌরশক্তি-চালিত সাইকেল রিক্সা তৈরী করা। টো-টোর থেকে এ-ধরণের রিক্সার সুবিধে অনেক :

(১) দামের দিক থেকে অনেক সস্তা,

(২) দেশেই সারানো যাবে অল্প খরচে ইত্যাদি। প্রাথমিক স্তরে সুপারক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়ত

সম্ভব হবে না, খরচটা কম রাখার জন্যে, কিন্তু সৌরশক্তি দিয়ে চার্জ করা ব্যাটারী দিয়ে চালালে খারাপ হবে না বলেই আমাদের ধারণা। টো-টোর মত জোরালো 48 volt এর ব্যাটারীর বদলে 12 বা 24 volt দিয়ে চালানো যাবে।

নীচের ছবিতে ফেরী নৌকোর মডেলটি যেমন সৌরশক্তি-চালিত ব্যাটারী দিয়ে চলছে।

সৌরশক্তি দিয়ে চার্জ করা ব্যাটারী-চালিত ফেরী নৌকোর model

আমরা অবশ্য ইতিমধ্যেই ওটিকে সুপারক্যাপাসিটর দিয়ে ব্যাটারী ছাড়াও চালাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছি। দেশে সুপারক্যাপাসিটর যতদিন না পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন এই ম্যাজিক জিনিসটির পূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা বেশ কঠিন। অথচ দেশে এত বড় বড় ন্যানোল্যাব থাকা সত্ত্বেও কেন এটা সম্ভব হচ্ছে না, তার উত্তর নেই।

এত রোদ যে-দেশে, সেখানেও কেন দুঃস্থ কোন স্কুল পড়ুয়াকে মোম বা কেরোসিনের আলোয় পড়তে হবে, তা বোঝা কঠিন।

পরিশেষে, কয়েকটা কথা একটু মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। যাঁরা মনে করেন সুইচ টিপলে কারেন্ট না এলে সরকারের দোষ, তা সে যে-দলের সরকারই হোন না কেন, তাঁদের ধারণা দেওয়ার জন্যে বলতে হচ্ছে যে আমাদের দেশে তথাকথিত শক্তির ঘাটতির কথা বলা হয়, তার প্রতিকারের উপায় কিন্তু প্রকৃতিই করে রেখেছে। আমরা যদি তার ব্যবহার না করি তাহলে আমাদেরই বোকামি। প্রতিদিন সূর্য থেকে যে পরিমাণ শক্তি পৃথিবীর ওপর এসে পড়ে, তা সারা বছরে আমরা সমস্ত দেশ মিলে যা শক্তি খরচ করি তার থেকেও অনেক বেশী। সূর্য থেকে শক্তি সঞ্চয় করে গাছপালা দিব্যি আছে, সব জায়গায়, বছরের পর বছর। আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি এমন সব জ্বালানীর ব্যবহারে যেগুলি সহজে পাওয়ার নয়, যেমন খনিজ তেল, বা অতি খরচাসাপেক্ষ ও ভয়ঙ্কর, যেমন নিউক্লিয়ার শক্তি।

> এত রোদ যে-দেশে, সেখানেও কেন দুঃস্থ কোন স্কুল পড়ুয়াকে মোম বা কেরোসিনের আলোয় পড়তে হবে, তা বোঝা কঠিন।

এর বিকল্প হিসেবে সৌরশক্তির উপযোগিতা তো সকলের কাছে পরিষ্কার বলে আমাদের মনে হয়। এখন দরকার গবেষণার যাতে সেই শক্তি সহজে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। যখন ভাবি আমাদের দেশে নিউক্লিয়ার শক্তির গবেষণার জন্যে যা খরচ হয়েছে, বিকল্প শক্তির গবেষণার জন্যে তার 1% ও হয়নি, তখন অবাক বিষ্ময় ছাড়া আর কিছু মনে হয়না। আমরা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জাহির করে থাকি উচ্চৈস্বরে, 'Brand India' নামক অলীক ছাপের বড়াই করি অনবরত, অথচ সৌরশক্তি ও বিকল্প শক্তির গবেষণায় এতটাই পিছিয়ে রয়েছি যে অন্যদেশে তৈরী সুলভ সৌরপ্যানেলের সমকক্ষ কোনও প্যানেল তৈরী করে উঠতে পারলাম না এ-যাবৎ! পাছে ব্যবসায় ক্ষতি

হয়, সেজন্য দেশের সৌরপ্যানেল বিক্রেতারা বিদেশে তৈরী ভালো প্যানেল এ-দেশে বিক্রীর ক্ষেত্রে সরকারকে উপরি কর নির্ধারণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন, এ-খবরটি যেমন হাস্যকর তেমনই দুঃখের। এত রোদ যে-দেশে, সেখানেও কেন দুঃস্থ কোন স্কুল পড়ুয়াকে মোম বা কেরোসিনের আলোয় পড়তে হবে, তা বোঝা কঠিন। এবং, এই অভাবের প্রতিকারের উৎকৃষ্ট উপায় হাতে থাকতেও কেন তা উপেক্ষা করে চলেছি বছরের পর বছর, সেটা বোঝা সত্যি দুষ্কর।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2015/04/05/solar-energy/

অটিজম-এর কি একটাই দাওয়াই?

অলকানন্দা রুদ্র

বেন-গুরিয়েন বিশ্ববিদ্যালয়

অটিজম এমন একটা মনের অসুখ যেখানে মানুষ সবরকম সামাজিক সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চায়। রোগটা এমনই যে সারা জীবন থেকে যায়। শুধু তাই নয়, পরবর্তী প্রজন্মও উত্তরাধিকার সূত্রে এই রোগটা পেতে পারে।। ২০১৪ সালের একটা গণনা অনুযায়ী, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক ৬৮ জন শিশুর মধ্যে একজনের অটিজমের লক্ষণ পাওয়া গেছে।

অটিজম শব্দটা এসেছে একটা গ্রিক শব্দ থেকে: "অটোস" অর্থাৎ অহং। শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন অয়গেন ব্লয়লার (Eugen Blueler) নামে একজন সুইস মনোবিজ্ঞানী। ১৯১১ নাগাদ উনি 'অটিজম' শব্দটা ব্যবহার করেন স্কিজোফ্রেনিয়ার কিছু বিশেষ উপসর্গকে বোঝাতে। তারপর, ১৯৪০-এর দশকে ব্রিটেনের গবেষকরা কথাটা বাজারে আনলেন সামাজিক বা মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের বোঝাতে। জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক লিও ক্যানার বেশ কিছু শিশুর অসামাজিক আচরণের কারণ বোঝার চেষ্টা করছিলেন। তিনিও এই শব্দটাই বেছে নিলেন। এদিকে একই সময়ে হান্স অ্যাস্পার্গার নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী খুবই কাছাকাছি কিছু উপসর্গ লক্ষ্য করলেন। সেগুলোকে এখন অ্যাসপার্গার্স সিনড্রোম বলা হয়।

সংক্ষেপে বললে, অটিজম-এর তিনটে প্রধান বিশেষত্ব রয়েছে:

১) সামাজিক প্রতিবন্ধকতা
২) ভাষা বা অন্য উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করতে অক্ষমতা
৩) কিছু বিশেষ ক্রিয়াকলাপে এতটাই মশগুল থাকা যে দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে

অটিজম ধরা পড়ে কিভাবে?

অটিজমের রোগনির্ণয় বা ডায়াগনোসিস করার কোনো ডাক্তারী পরীক্ষা এখনো পর্যন্ত বেরোয়নি। তার বদলে চিকিৎসক বা মনোবিজ্ঞানীরা অটিজম নির্ণয় করতে আচরণ-সংক্রান্ত কিছু সর্বস্বীকৃত পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। রোগের উপসর্গের উপর ভিত্তি করে একটা নিয়মাবলী মেনে রোগীকে একটা স্কোর দেওয়া হয়। স্কোর একটা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তখন রোগী সন্দেহের আওতায় পড়ে। তারপর পাকাপাকিভাবে অটিজম সাব্যস্ত করতে একটা পাঁচমেশালী বিশেষজ্ঞ দলের প্রয়োজন হয়। তাতে থাকে শিশুরোগের বিশেষজ্ঞ বা পিডিয়াট্রিসিয়ান, মনোবিজ্ঞানী, স্পিচ-ল্যাংগুয়েজ প্যাথলজিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট-এর মত হরেক বদ্যি।

বিজ্ঞানীদের কাছেও অটিজম একটা পুরনো ধাঁধা। অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও যার কোনো সুরাহা হয়নি। আর সব মস্তিষ্কের ব্যারামের থেকে অটিজম বেশ আলাদা। একে তো, উপসর্গের বৈচিত্র্য দেখে রোগটা কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ বোঝা যায় না। তায় আবার বিভিন্ন রোগীর মধ্যে অটিজমের প্রকাশ হয় বিভিন্ন মাত্রায়। তাদের বাহ্যিক চালচলন আলাদা, তাদের স্বাধীন ভাবনাচিন্তার ক্ষমতাও আলাদা। এই বিপুল বৈচিত্র্যকে বোঝাতে অটিজমকে একটা বড়সড় দলে ফেলা হয় – অটিজম স্পেকট্রাম কন্ডিশনস বা এ.এস.সি.।

উপসর্গের ফুলঝুড়ি

প্রথমে, উপসর্গের বৈচিত্র্যকেই ধরা যাক। অটিজমের সবচেয়ে স্পষ্ট ছাপ পড়ে সামাজিক আদান প্রদানের মধ্যে। কিন্তু, সেখানেও নানারকম সম্ভাবনা দেখা যায়। কেউ কেউ লোক সমাজে কথাই বলতে পারেনা, কেউ বা কথা বললেও নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেনা। আরেকটা লক্ষণ হলো, সামাজিক আদবকায়দায় চূড়ান্ত আনাড়িপনা। যেমন, লোকসমাজে কি বলতে আছে, কি নেই, বুঝি না। কার সাথে কিরকম ভাবে ব্যবহার করতে হয়, সে জ্ঞান নেই। বন্ধু পাতানো, কি সামান্য বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা, স্বভাবের মধ্যেই নেই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশেষ কয়েকটা বাঁধাধরা কাজে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা, অস্বাভাবিক মনোযোগ সহকারে ঘুরেফিরে একই জিনিস বারবার করে চলা - এরকমটা অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে প্রায়শই দেখা যায়।

ছবির উৎস: উইকিপিডিয়া

শুধুমাত্র সামাজিক আচরণের মাধ্যমেই যে অটিজম প্রকাশিত হয়, তাও নয়। বন্ধ দরজার আড়ালেও তাকে দেখা যায়। যেমন, বিশেষ কয়েকটা বাঁধা ধরা

কাজে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা। অস্বাভাবিক মনোযোগ সহকারে ঘুরেফিরে একই জিনিস বারবার করে চলেছে, এরকমটা অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে প্রায়শই দেখা যায়। যেমন, সারবেঁধে পুতুল সাজাচ্ছে কিম্বা একনাগাড়ে খেলনা-গাড়ির চাকা ঘুরিয়ে চলেছে।

কিন্তু অনেক সময় তাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি সজাগ হয়। আপনিআমি যেসব ঘটনাকে লক্ষ্যই করব না-, যেমন গাছের পাতা নড়া বা দেওয়ালে আলোর খেলা, সেগুলো তাদের কাছে চলচ্চিত্রের মত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এর খারাপ দিকটা হলো, আপনিআমি যেসব অসুবিধেকে পাত্তাই দেবো না-, সেগুলোকে তারা উপেক্ষা করতে পারে না। অনেক সময় তো সেসব তাদের কাছে বিভীষিকার আকার ধারণ করে। যেমন, কোনো বিশেষ ফ্যাব্রিকের ছোঁয়া, কিম্বা বিশেষ কম্পাঙ্কের শব্দ, বা হয়ত কোনো অপছন্দের রং বা খাবারে হালকা বিস্বাদ। লেখিকা ডোনা উইলিয়ামসে কথায় :"তীব্র আলো, রঙের বাহার আর হাজারো নক্সা, এই সব মিলিয়ে ইন্দ্রিয়ের উপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ে। তাতে দেহ এমনভাবে সাড়া দেয় যেন ক্রমাগত আক্রমণ চলছে তার উপর। একে একে আসে মাথা ধরা, উৎকন্ঠা, থেকে থেকে দুশ্চিন্তা কিম্বা পাল্টা আক্রমণের প্রবৃত্তি।"

প্যাটার্ন বা নক্সা খুঁজে পাওয়ার দক্ষতায় সাধারণ লোকে অটিস্টিক লোকজনের ধারেকাছেও আসে না।

যেমন, নিচের ছবিতে যে একটা ত্রিভুজ রয়েছে, সেটা একজন অটিস্টিক ব্যক্তির সাধারণ লোকের থেকে অনেক আগেই চোখে পড়বে।

এই ছবিতে যে একটা ত্রিভুজ রয়েছে, সেটা একজন অটিস্টিক ব্যক্তির সাধারণ লোকের থেকে অনেক আগে চোখে পড়বে।

সবাই একরকম হয়না

এবার দ্বিতীয় বিষয়টাতে আসা যাক। সব অটিস্টিক রোগী একরকম হয়না। একদিকে আছে আদি-অকৃত্রিম অটিজম, যেখানে কথা বলাটাই একটা চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে রয়েছে অ্যাসপার্গার্স সিনড্রোম, যেখানে কথা বলতে কোনো সমস্যা নেই। আই. কিউ. স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের উপরে। কিন্তু দুই ধরনের অটিস্টিক রোগীর ক্ষেত্রেই অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলো একই বা সাধারণ আগ্রহের জায়গাটা একইরকম সীমিত, যা সাধারণভাবে স্বাভাবিক মানুষের সাথে মেলে না। এদিকে, অ্যাসপার্গার্স-ওয়ালাদের চমকে দেওয়ার মত কিছু ক্ষমতা থাকে। কেউ হয়তো অসাধারণ শিল্পী, কেউ সংখ্যা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, কেউ আবার অঙ্ক বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মত খুঁটিনাটি বিষয়ে চ্যাম্পিয়ন।

এখানেই বৈচিত্র্যের শেষ নয়। সাধারণ মানুষের, অর্থাৎ যারা অটিস্টিক প্রমাণিত হয়নি তাদের মধ্যেও এইসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একটু আধটু দেখা যায়। প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট সাইমন ব্যারন-কোহেন দেখিয়েছিলেন, সমাজে গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ বা ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে অটিজম-সম বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশি লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণেই, অটিজমকে একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের শ্রেণীর মধ্যেও ফেলা হয়। নামটা আগেই বলেছি, অটিজম স্পেকট্রাম কন্ডিশনস বা এ.এস.সি.।

সমাজে গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ বা ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে অটিজম-সম বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশি লক্ষ্য করা

অটিজম নিয়ে গবেষণা

এত যে হরেকরকম উপসর্গ, তার পিছনে কি কোন একটা মাত্র কারণকেই দায়ী করা যায়? ক্লাসিক অটিজম থেকে অ্যাসপার্গার্স সিনড্রোম – সবরকম রোগীকেই কি বলা সম্ভব, "হ্যাঁ, অমুক জায়গা থেকেই রোগটা আসছে"? এর উত্তর পেতে হলে, অটিজম নিয়ে কিভাবে গবেষণা হয়, সেটা একটু ভালো করে দেখতে হবে।

মূলত, তিনটে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গবেষণাটা চলে।

১) জেনেটিক গবেষণা – ক্রোমোসোমে খুঁত ধরা, সম্পূর্ণ জিনোমের সিকোএন্সিং করা বা অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে জিনের উপর কারিকুরি করা – সব এই ধরণের গবেষণার আওতায় পড়ে।

২) স্নায়বিক গবেষণা – সাধারণত, এই গবেষণায় ম্যাগনেটিক রেসনান্স ইমেজিং (এম.আর.আই.) বা ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাফির (ই.ই.জি.) মাধ্যমে অটিস্টিক রোগীর মস্তিষ্কের ছবি তুলে তার সাথে সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কের ছবির তুলনা করা হয়।

৩) রোগীর হাবভাবের উপর নজর রাখা। বেশ কিছু পরীক্ষা হয় যার দ্বারা চটজলদি সাধারণের থেকে অটিস্টিক লোকজনকে আলাদা করা যায়। একটা পরীক্ষার কথা আগেই বলেছি – লুকোনো আকৃতি খুঁজে বার করা। একে বলে, এমবেডেড ফিগারস টেস্ট।

অটিজম কি একটাই রোগ?

'অটিজম আসলে একটাই রোগ', এই ধারণাটার বিপক্ষে সবথেকে বেশি প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রথম ধরণের গবেষণার ফল থেকে। এখনো অব্দি কেউ সবকটা উপসর্গের পিছনে কোনো একটা বিশেষ জিনকে দায়ী করতে সক্ষম হয়নি। তার জায়গায় বেশ কয়েকটা জেনেটিক প্যাটার্ন বা সজ্জা পাওয়া গেছে, যাদের অটিজমের সাথে সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। তাও মানা যেত, কিন্তু সেই প্যাটার্নগুলো অন্য কিছু মানসিক রোগের সাথেও যুক্ত। আচরণ-সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষা থেকেও একটা ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

স্নায়বিক লাইনে একটু আশা দেখা গেছিল। নিউরোইমেজিংয়ের দ্বারা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের গঠন এবং কাজকর্ম সম্বন্ধে জানা যায়। প্রথম দিকে দেখা যাচ্ছিল যে অটিস্টিক ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ মস্তিষ্কের আয়তন এবং বিশেষ কিছু জায়গা, যেমন অ্যামিগডালা ও সেরিবেলাম, এদের আয়তন একটু বেশি[৪]। উপসর্গগুলো কতটা বাড়াবাড়ি রকমের, তার সাথে মস্তিষ্কের গঠনের একটা সম্পর্কও পাওয়া গেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আরও পাকাপোক্ত পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হলে-, এই সম্পর্কগুলোর সপক্ষে সেরকম জোরালো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তার কারণ হতে পারে, প্রথমদিকের গবেষণাগুলো মাত্র গুটিকয়েক লোকের উপরই করা হয়েছিল। আবার অন্য আরেকটা কারণ এটাও হতে পারে, বিভিন্ন গবেষণায় যে বয়েসের গোষ্ঠী নিয়ে কাজ করা হচ্ছিল, তাদের মধ্যে অনেক ফারাক।

অটিজমের যে হরেকরকম উপসর্গ, তার পিছনে কি কোন একটা মাত্র কারণকেই দায়ী করা যায়?

মস্তিষ্কের গঠন তো গেল একটা দিক। এটা ছাড়াও ফাংশানাল ইমেজিংয়ের সাহায্যে দেখা হয়েছে, কিছু বিশেষ কাজের সময় মস্তিষ্কের কোনো একটা অংশের ক্রিয়াকলাপে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে কিনা। কাজগুলো এমন যাতে অটিস্টিক রোগীরা হোঁচট খায়, যেমন মুখ চেনা বা ভাষার সুক্ষ্ম তারতম্য বোঝার চেষ্টা করা। তাতে কিছু অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ ধরাও পড়েছিল। কিন্তু এই গবেষণার ফলাফল বয়েস নির্বিশেষে প্রযোজ্য কিনা, সেই নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে বিতর্ক রয়েছে। এবং এই পদ্ধতিগুলো এক একটা উপসর্গের পিছনে ঠিক কি হচ্ছে, সেই প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়। তাই এখনি নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না যে নিউরোইমেজিংয়ের মাধ্যমেই একটা সম্পূর্ণ তত্ত্ব বেরিয়ে আসবে।

অন্যভাবে ভাবা যাক

এসব দেখে কিছু নামী বিশেষজ্ঞ বলেছেন, অটিজমের একমেবাদ্বিতীয়ম ব্যাখ্যার পেছনে ধাওয়া করার দিন শেষ। তার পরিবর্তে, সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বিভিন্ন উপসর্গগুলোকে আলাদা আলাদা করে দেখতে হবে। যেমন, রোগীর অবস্থা কতটা খারাপ, তার একটাই রেটিং দেওয়ার মানে হয়না। তার থেকে সামাজিক উপসর্গের উপর একটা রেটিং, কাজকর্মের উপসর্গে আরেকটা রেটিং, ইন্দ্রিয়ের প্রখরতায় একটা তৃতীয় রেটিং — এরকম দেওয়া গেলে ছবিটা অনেক স্পষ্ট হয়। আর মলিকুলার জেনেটিক্সের ক্ষেত্রেও একটাই 'অটিজম জিন' খোঁজার চেষ্টা ছাড়া উচিত। তার থেকে বিভিন্ন উপসর্গের পেছনে কি জেনেটিক প্যাটার্নের অবদান রয়েছে, সেই খোঁজেই জোর দেওয়া উচিত। কারণ, এটা তো মোটামুটি স্পষ্ট যে বেশিরভাগ জিনই একা অনেকগুলো উপসর্গের জন্যে দায়ী নয়।

কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যায়। একটা যদি ব্যাখ্যা না পাওয়া গেল তো এই বিভিন্ন উপসর্গগুলো একসাথে হানা দেয় কেন? কাকতালীয় তো হতে পারেনা। জেনেটিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একটা ব্যাপার

লক্ষ্যনীয়। যদিও বেশিরভাগ জিন একটাই উপসর্গের সাথে জড়িত, কিছু জিন আছে যারা একাধিক উপসর্গের জন্ম দেয়। সেখানেই কি তবে রহস্যের চাবিকাঠি? অথবা, আচরণসংক্রান্ত - গবেষণার দিক থেকে দেখলে, এটা কি হতে পারে যে এক ধরণের অক্ষমতার সাথে আরেকটার সম্পর্ক রয়েছে? হয়তো, একটা অক্ষমতা এলে আরেকটা আসবেই আসবে?

একমেবাদ্বিতীয়ম ব্যাখ্যার সন্ধান ছাড়লে অটিজমের 'একটিই' চিকিৎসার সন্ধানও ছাড়তে হয়। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যেসব পরিবার তাদের শিশুদের কি হয়েছে বোঝবার চেষ্টা করছে, যে মনোরোগ-বিশেষজ্ঞগণ রোগীদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথ বাতলাচ্ছে, যেসব অটিস্টিক ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে নিজেদের ক্ষমতা ও অক্ষমতার সাথে পরিচিত হচ্ছে, কিম্বা যেসব গবেষক নতুন ওষুধবিহীন - চিকিৎসা পদ্ধতি খুঁজছে, তাদের কাছে এটা একটা নতুন ভাবনার খোরাক। তবে যদ্দিন না রহস্যের সমাধান হচ্ছে, উপসর্গগুলোকে বোঝা এবং কাবু করা ছাড়া উপায় নেই।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2015/11/30/autism/

(লেখাটি ইংরাজী থেকে অনুবাদ করেছে অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়।)

লেখা দিতে হলে

বৈদ্যুতিন লোকবিজ্ঞান (Popular Science) পত্রিকা বিজ্ঞান (http://bigyan.org.in)-এর বিভিন্ন বিভাগগুলিতে বিষয়ভিত্তিক লেখার জন্য আমরা সকলকেই আমন্ত্রণ জানাই।

বিজ্ঞান-এ লেখা পাঠানোর আগে লেখক অবশ্যই রচনার নিয়মাবলীটি পড়ে দেখুন।

আমরা যে ধরণের লেখা পেতে আগ্রহী

- বিজ্ঞানের (ব্যাপক অর্থে – গণিত ইত্যাদি সহ) কোন ধারণা বা concept-এর সহজ এবং অভিনব ব্যাখ্যা। যা সহজে পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায় না অথবা অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে ভালভাবে বর্ণনা করা থাকে না। লেখকদের কাছে অনুরোধ আপনারা সাধারণ রচনাধর্মী লেখা পাঠাবেন না।
- কোন উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু ঘটনা, যা পড়ে তাঁর গবেষণা ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। উইকিপিডিয়ার রচনামূলক ধাঁচের বদলে, কোন বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদান এবং সেই আবিষ্কারের তাৎপর্যের উপর সংক্ষিপ্ত লেখাগুলো সাধারণত সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়।
- কোন গবেষণার বিষয়ের বর্ণনা যা পাঠককে সেই বিষয়ে আরো জানতে অনুপ্রাণিত করবে। এক্ষেত্রে খুব বেশী টেকনিক্যাল টার্ম না ব্যবহার করা বিধেয়।
- নিজে কর – সহজে বাড়িতে বা স্কুলে তৈরী করা যেতে পারে বা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এমন কোন বিষয়!
- বিজ্ঞানের কোন বিশেষ সমস্যা, যা বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে/ভাবিয়েছে তার বর্ণনা।
- বিজ্ঞানের খবর বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় যা বর্তমানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি। এইধরণের বিষয়ে নতুন কোন আবিষ্কার বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি কাম্য। কেবল মাত্র সমস্যার সাধারণ বর্ণনা যা উইকিপিডিয়ায় পাওয়া যাবে তা নয়।
- বিজ্ঞান বা অঙ্কের মজার ধাঁধা।

কিছু নিয়মকানুন

- লেখাটি বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। মেটাফিজিক্স জাতীয় লেখা পেতে আগ্রহী নই আমরা।
- রাজনৈতিক বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সমালোচনামূলক লেখা দয়া করে পাঠাবেন না।
- সম্পাদক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবাচিত হবে।
- লেখাতে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্যের উৎস উল্লেখ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়াও লেখার শেষে প্রাসঙ্গিক কিছু লেখা বা ভিডিও-র লিঙ্ক দিলে কৌতূহলী পাঠকের উপকারে আসবে।

লেখার খুঁটিনাটি

- প্রতিটি লেখা বাংলা হরফে (Unicode) Google doc ফাইল হিসেবে ই-মেল-এ জুড়ে পাঠাতে হবে। ছবির ক্ষেত্রে best possible resolution-এ পাঠাতে হবে।
- ই-মেল-এ বিষয় এবং কোন বিভাগের জন্য লেখা পাঠাচ্ছেন তা উল্লেখ করুন। সেই সাথে আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানান।
- ই-মেল করুন bigyan.org.in@gmail.com-এ।